দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণের অজুহাতে ছাত্র ভর্তি বন্ধ রাখা সংখ্যালঘু তোষণের নির্লজ্জ প্রয়াস— পৃঃ ১৩

সিএএ যথেষ্ট নয় : বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য চাই 'হিন্দু ল অব রিটার্ন' আইন প্রণয়ন — পৃঃ ১১

৭৮ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।। ১৫ ভাদ্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাহীন নৈরাজ্য

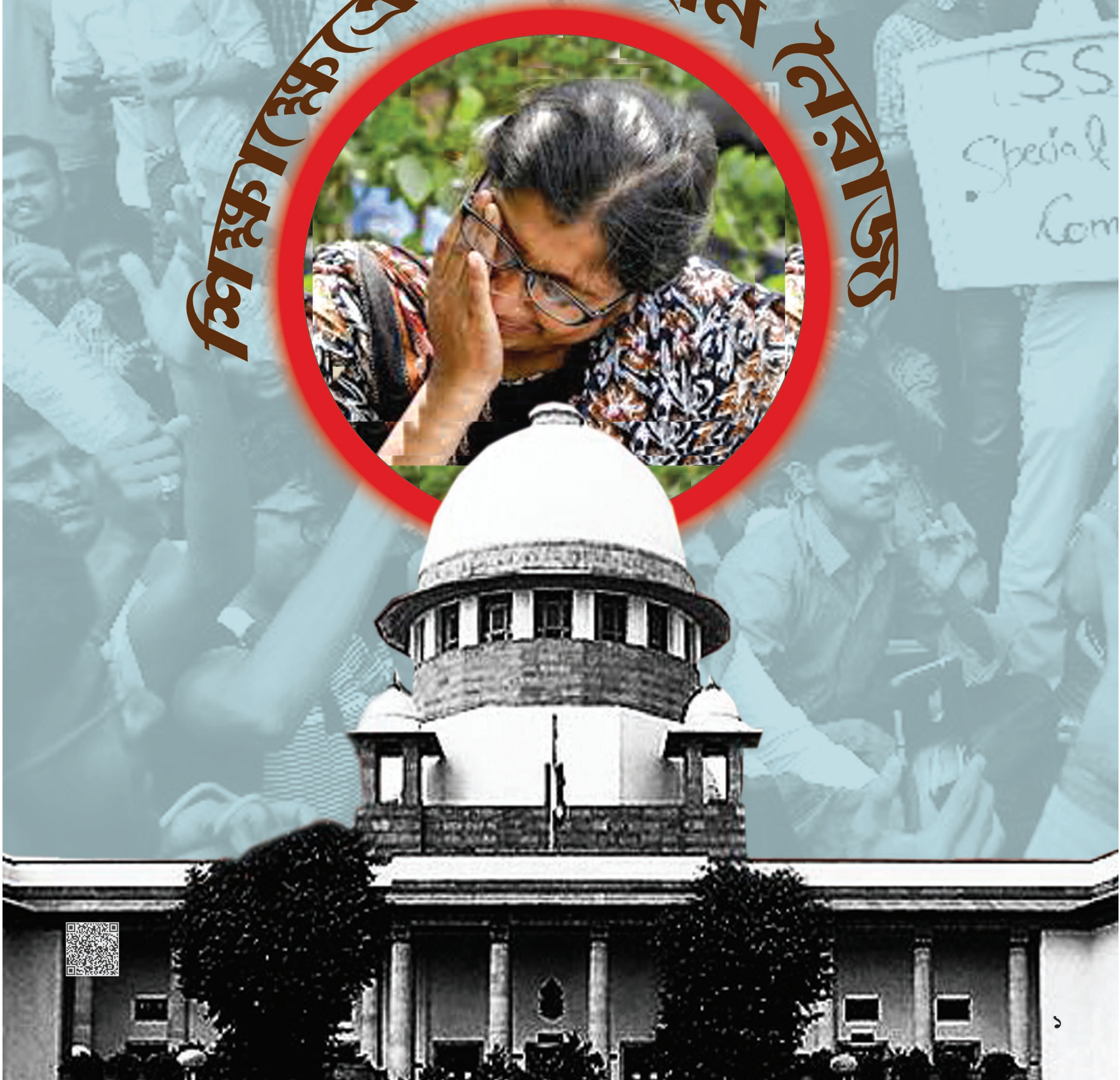

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৫ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১ সেপ্টেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

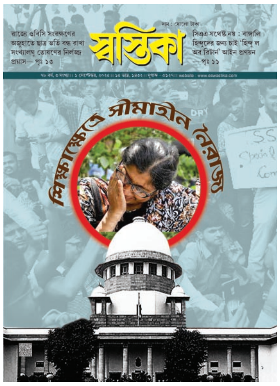

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও শ্রীঅরবিন্দের প্রশ্ন ছিল ‘পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের কী অবস্থা?’ : ঋষিবাক্য মিথ্যা হয় না
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

আধারে ভোটার নয় ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কৌশলগত ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে দৃঢ়প্রত্যয়ী সংগ্রাম
◻ দেশ কাপুর ◻ ৮

রাজ্য সরকারের অপশাসন বাঙ্গালির শিক্ষার সর্বনাশ নিশ্চিত করেছে ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

সিএএ যথেষ্ট নয় : বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য চাই ‘হিন্দু ল অব রিটার্ন’ আইন প্রণয়ন ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণের অজুহাতে ছাত্র ভর্তি বন্ধ রাখা সংখ্যালঘু তোষণের নির্লজ্জ প্রয়াস ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১৩

এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ আছে
◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১৬

ভারতের সংবিধানে সংস্কার : অমিত শা’র আনা ১৩০তম সংশোধনী বিল ◻ অরুণ কুমার চক্রবর্তী ◻ ১৮

পঁচাত্তরের প্রাক্কালেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বমহিমায় উজ্জ্বল
◻ অজয় ভট্টাচার্য ◻ ২০

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ধর্মঘট লক্ষ্যহীন নিমেষে ভরা
◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৩

জাতি-জনজাতির মিলনক্ষেত্র শ্রীশ্রী মা ত্রিপুরেশ্বরী
◻ অপু সাহা ◻ ৩১

মণিপুরী হলেও ত্রিপুরী সংস্কৃতির অঙ্গ লাইনিংথৌ পাংখাবা মন্দির
◻ ইন্দ্রজিৎ সাহা ◻ ৩৩

অগ্নিযুগের বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ
◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৪

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ
◻ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৫

ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার শুল্কযুদ্ধ ঃ সমস্যা ও প্রতিকার
◻ অম্লান কুসুম ঘোষ ◻ ৩৮

নাগপুর, রামটেক তীর্থক্ষেত্র দর্শন ◻ অমিত কুমার চৌধুরী ◻ ৪৩

রাজ্যে জনবিন্যাস পালটানোর ছক : প্রবুদ্ধ সমাজ কতদিন চুপ থাকবে? ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৭

গল্পকথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ স্মৃতিচারণ : ৪৮

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
৮ সেপ্টেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৮ সেপ্টেম্বর
২০২৫

বিরোধী জোট-নির্বাচন কমিশন সংঘাত

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে বিহারে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ। মৃত, স্থানান্তরিত, অনুপ্রবেশকারী ও জাল ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হতেই প্রমাদ গুনেছে দেশের সেকুলার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। অস্তিত্বের সংকটের আশঙ্কায় তারা সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়েরের পাশাপাশি দেশজুড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য

আটশত বৎসরের ইসলামি শাসন এবং দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনেও বঙ্গপ্রদেশে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায় এত দুর্দিন বোধ হয় আসে নাই। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে দলতন্ত্র ও স্বজনপোষণের শুরু বাম শাসনকালে হইলেও তাহার অন্তর্জলিযাত্রা বর্তমান রাজ্য সরকারের শাসনকালেই প্রকট হইয়াছে। বাম শাসনে প্রতিবাদী মুখ না থাকিবার কারণে তাহা প্রকাশ্যে আসিবার সুযোগ পায় নাই। বর্তমান সময়ে বিচার বিভাগের তৎপরতা এবং অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় বিচারপতিদিগের সদিচ্ছার কারণেই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে দ্রুত দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে, তাহা জনসমক্ষে আসিয়াছে। ২০২২ সালের ২৩ জুলাই বর্তমান রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হস্তে গ্রেপ্তারি প্রমাণ করিয়াছে রাজ্যের শিক্ষার অন্তর্জলিযাত্রায় রাজ্য সরকারই শামিল রহিয়াছে। যোগ্য শিক্ষক প্রার্থীদের বঞ্চিত করিয়া বিশাল পরিমাণ উৎকোচের বিনিময়ে অযোগ্যদের নিয়োগ করিয়া বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চালাইয়াছে রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের সম্পূর্ণ শিক্ষাবিভাগ এই দুর্নীতিতে জড়িত রহিয়াছে। বিচার বিভাগের তৎপরতায় শিক্ষাবিভাগের আধিকারিকগণ কারান্তরালে গিয়াছেন। বাম আমলে শুরু হইলেও বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলেই শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক অবক্ষয়ের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার হারে যে পশ্চিমবঙ্গ একসময় প্রথম সারিতে অবস্থান করিত তাহা আজ একেবারে তলানিতে ঠেকিয়াছে। সিবিআই তদন্তেই উঠিয়া আসিয়াছে, বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে বিদ্যালয় স্তরে এসএসসি-র মাধ্যমে আটহাজারেরও বেশি অযোগ্য প্রার্থী অনৈতিকভাবে উৎকোচ প্রদান করিয়া, যোগ্যদিগকে বঞ্চিত করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। গ্রুপ ডি এবং সি-রও অধিকাংশ একেবারে সাদা খাতা জমা করিয়া চাকুরি পাইয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থায় দৈন্যের কারণে রাজ্যের কলেজগুলিতে পড়ুয়ারা ভর্তি হইতে সাহস পাইতেছে না। ইহার বড়ো প্রমাণ হইল, ২০২৪ সালে এই রাজ্যের কলেজগুলিতে ত্রিশ শতাংশ আসন খালি পড়িয়াছিল। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। অভিভাবকগণ সরকারি বিদ্যালয়ে তাহাদের ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাইবার সাহস পাইতেছেন না। এই বৎসরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে সংবাদপত্রে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং উচ্চ বিদ্যালয় মিলিয়া রাজ্য সরকার আটহাজারেরও অধিক বিদ্যালয় চিহ্নিত করিয়াছে যেগুলিতে ছাত্রসংখ্যা ত্রিশেরও কম।

রাজ্যে উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজ করিতেছে। খুবই চিন্তার বিষয় যে, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির হার জাতীয় গড়ের চাইতে অনেক পিছিয়ে। জনমোহিনী নীতির বশবর্তী হইয়া রাজ্য সরকার গত দশ বৎসরে রাজ্য জুড়িয়া ১৯টিরও বেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করিয়াছে। দলীয় রক্তচক্ষুর কারণে রাজ্যে বহু মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বহু মেডিক্যাল কলেজেও পরিকাঠামো ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে কমতি রহিয়াছে। চিন্তা করিবার বিষয় হইল, সমগ্র দেশে মেডিক্যালের আসন যেখানে বৃদ্ধি করা হইতেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের চিত্র ঠিক বিপরীত। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ২৬টি আসন কমাইয়া দিয়াছে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন। এনআরএস, আরজি কর, কেএমসি-তে এমডি বা এমএস আসন সংখ্যা কমানো হইয়াছে। রাজ্যের মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ওবিসি সংরক্ষণ ১৭ শতাংশ হইবে না ৭ শতাংশ, এই আইনি জটিলতার কারণে উচ্চশিক্ষায় ভর্তির প্রক্রিয়া স্থগিত রাখিয়াছে রাজ্য। ১০ শতাংশ আসন ওবিসি সংরক্ষিত থাকিবে কিনা, এই প্রশ্নের উদ্রেক করিয়া ৯০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে সরকারি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিবার প্রয়াস চলিতেছে। শুধু শিক্ষাব্যবস্থা নহে, সম্পূর্ণ রাজ্যকে নৈরাজ্যে পরিণত করিবার দায় বর্তমান রাজ্য সরকারকেই লইতে হইবে। শিক্ষা যে জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষকগণই যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নির্মাণের কারিগর — দুর্নীতি ও ক্ষমতার লোভে পড়িয়া শাসক দলের নেত্রী এই আপ্তবাক্যটিকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। রাজ্যটিকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া অশিক্ষিত ও মূল্যবোধহীন নাগরিক তৈরি করাই তাঁহার লক্ষ্য। শাসকদলে ইহাদেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারতের নবজারণের পীঠস্থান বঙ্গভূমিকে বাঁচাইতে হইলে সর্বপ্রকার দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই রাজ্য সরকারের অপসারণই যে একমাত্র পথ, তাহারই সংকল্প রাজ্যবাসীকে করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ।। (বাল্মীকি রামায়ণ ৪।৬।২২)

আমি এই কেয়ূর চিনি না, আমি এই কুণ্ডল চিনি না। কিন্তু নিত্য চরণবন্দনার কারণে আমি তাঁর এই নূপুর চিনতে পারছি।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও শ্রীঅরবিন্দের প্রশ্ন ছিল 'পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের কী অবস্থা?'

ঋষিবাক্য মিথ্যা হয় না

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

৪ ডিসেম্বর, ১৯৫০। পণ্ডিচেরিতে অন্তিম শয্যায় শ্রীঅরবিন্দ। ৫ ডিসেম্বরে তখন গভীর রাত্রি। রাত ১.২০ মিনিটে তিনি প্রয়াত হন। নামজাদা শল্য চিকিৎসক প্রভাত সান্যাল (এফআরসিএস)-কে তিনি শেষ প্রশ্ন করেছিলেন— 'পূর্ববঙ্গের কী অবস্থা, বিশেষ করে বাস্তুহারাদের?' পণ্ডিচেরি থেকে শ্রীঅরবিন্দের শারীরিক অবস্থার বার্তা পেয়ে বিমানে সত্বর ৩০ নভেম্বর সেখানে পৌঁছেছিলেন ডাঃ সান্যাল। শ্রীঅরবিন্দের প্রয়াণের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দেওয়া শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সম্মান প্রত্যাখ্যান করে বাকি জীবন তিনি পন্ডিচেরিতেই কাটিয়ে দেন। এখানে 'বাস্তুহারা' বলতে হয়তো তিনি সেই সময়কার উদ্বাস্তু হিন্দুদের কথাই বলতে চেয়েছেন, যদিও নির্দিষ্টভাবে কিছু বলেননি। মৃত্যুশয্যায় বিস্তারিত কিছু বলার অবস্থাতে ছিলেন না ঋষি। ডাঃ সান্যাল ঘরহারাদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেন এবং জানান যে কেবল ভগবানই তাঁদের সাহায্য করতে পারেন। শ্রীঅরবিন্দের উত্তর ছিল, 'হ্যাঁ, যদি তাঁরা ভগবানকে চায়।'

সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হবেই তা হলফ করে বলা যায়। আজীবন শ্রীঅরবিন্দ অনুগামী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গকে 'বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড' বা বাঙ্গালি হিন্দুদের বাসভূমি বানানোর স্বপ্নে ব্রতী ছিলেন। ফরাসি উপনিবেশ পণ্ডিচেরিতে থেকেও শ্রীঅরবিন্দ খবর রাখতেন যে দেশভাগ হয়েছে কিছু স্বার্থপর ও ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতার জন্য। জিন্নার শয়তানিতে ১৯৪০-এর 'পাকিস্তান প্রস্তাব' এবং তার পরিণামে দেশভাগকে মেনে নিতে পারেননি শ্রীঅরবিন্দ। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভার সদস্য তাঁর ছাত্র কেএম মুন্সি বা কুলপতি মুন্সিকে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বুঝিয়েছিলেন জিন্না কীভাবে ও কেন পাকিস্তানকে একটি শয়তান দেশে পরিণত করতে চায়। আর তাই কড়া সামরিক ব্যবস্থা ছাড়া পাকিস্তানকে কোনোভাবে বাগে আনা যাবে না। স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্ট তাঁর লেখা পাঁচটি স্বপ্ন বা 'ফাইভ ড্রিমস্' তিরুচিরাপল্লী রেডিয়ো থেকে সারা পৃথিবীতে সম্প্রচারিত হয়। দেশভাগের বিরোধিতার পাশাপাশি দ্বিতীয় স্বপ্নে তিনি জানিয়েছিলেন যে, পশ্চিমি দুনিয়াকে পিছনে ফেলে কীভাবে এশিয়ার উত্থান হবে ভারত ও চীনের হাত ধরে। আজ তার অনেকটাই সত্য।

যে পথের সন্ধান ঋষি দিতে চেয়েছিলেন অর্ধশতাব্দীর আগে, সেই পথেই কি এখন চলেছে পশ্চিমবঙ্গ? জিন্নারা তখন ছিল, এখনও আছে। আর থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে রাজ্যের ভোটাররা ২০২৬-এর ভোটে তাদের এড়িয়ে চলবে কিনা সেটাই দেখার। অনেকে প্রশ্ন তুলতেই পারেন যে, শ্রীঅরবিন্দের মতো মহাযোগী বা মহর্ষিকে সামনে নিয়ে এসে কেন ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনকে ঘুরিয়ে সমর্থন করতে চাইছি? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদের 'দুধেল গাই' বলে অপমান করেছিলেন। তাদের গায়ে লাগেনি। ভারতের দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হয়েও তারা সেই অপমান কেন মেনে চলেছে? সমস্ত অন্যায় সুবিধা পাওয়ার আশায় তারা নিজেদের সম্মান খুইয়ে তৃণমূলনেত্রীকে সঙ্গ দিচ্ছেন। এটা তাদের অযাচিত শখ। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুধর্মকে 'গন্দা ধর্ম' বললে হিন্দুরা যে ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করবে সেটাই স্বাভাবিক।

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার হিন্দুদের লড়াইকে আরও তীব্র করেছে। তাই লড়াইটা হিন্দু ঐক্য বনাম দুষ্ট রাজ্য সরকারের। যে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এতটা আগ্রহী, রাজ্যের মুসলমান সমাজের মধ্যে কি সেই আগ্রহ রয়েছে? তারা তৃণমূলনেত্রীর কাঁধে বন্দুক রেখেই চালাতে চান। তদের ভিতরেও যে বেনোজল ঢুকে তাদের বাসস্থানকে তোলপাড় করতে চায়, এটা তাদের বোঝার সময় এসেছে। এই বেনোজলের বেশিরভাগটাই বিতাড়িত রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান। এরা প্রথম দফায় বিদেশি বামপন্থী আর তার পরের পর্বে পারিবারিক তৃণমূল দলের মদতেই পশ্চিমবঙ্গের বেআইনি ভোটার হয়েছে। এই সংখ্যাটা নির্ধারণ করতে যাওয়া বোকামি, কারণ বেআইনি কাজের পরিমাপ অনুযায়ী কাজটি 'বেআইনি' কি না তা নির্ধারিত হয় না। 'এক' হলেও যা, 'এক কোটি' হলেও তা। হিসাব বলছে আনুমানিক ৩০ লক্ষ বীতশ্রদ্ধ পরিযায়ী শ্রমিক এ রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ভাতার লোভে তারা ফিরবে না। একটি ইংরেজি কাগজে তার বিস্তারিত কারণ প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি অর্থের নয়-ছয় করে দলীয় প্রচারাভিযান, জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির অপপ্রয়াস আর ভোটার কেনা তৃণমূলের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে শেষ রক্ষা হবে না। ঋষি বাক্য মিথ্যা হয় না।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

আধারে ভোটার নয়

ঘেঁটে ঘয়েষু দিদি,

আসলে আপনার কিন্তু বিহার দিয়ে খেলা ধরে ফেলেছে সুপ্রিম কোর্ট। আপনি তো বলছিলেন যে, স্যার দুর্নীতিগ্রস্ত। স্যারের সব খারাপ। স্যার মানে কোনো মাস্টারমশাই নন দিদি। তবে শিক্ষক তো বটেই। তিনি মানে নির্বাচন কমিশনই তো কানমুলে দেওয়া মাস্টারমশাই। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় এসআইআর মানে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিউ পশ্চিমবঙ্গে হবেই। আর আধার কার্ড দিয়ে কিছুই হবে না।

বিহারে যেদিন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই মিথ্যা প্রচার চলছে। কোন কোন নথি লাগবে তা নিয়ে নানা মিথ্যা প্রচারে আপনিও গলা ফাটিয়েছেন দিদি। কিন্তু কেউ ওসব কথা কানে তুলছে না। তারপরে এটাও প্রচার শুরু হয় যে আধার কার্ড দিয়েও আবেদন করা যাবে। এটা কিন্তু দিদি সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা। সেটা আপনিও ভালো জানেন। আপনি তো আইনজীবী। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ইংরেজি থেকে বাংলা আপনি ভালোই করতে পারেন।

SIR নিয়ে ADR (Association for Democratic Reforms) নামে একটি সংস্থা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে। এডি আর বনাম জাতীয় নির্বাচন কমিশন মামলায়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে মানুষকে ফের বোকা বানানোর খেলা শুরু হয়েছে। আপনি না চাইলেও দিদি, আমি সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই।

বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই মামলা শুনছে। আপনারা এও জানেন যে, বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬৫ লক্ষ মৃত, ভুয়ো, বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গার নাম বাদ গেছে। এই মামলাতেই গত ১৪ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, নির্বাচন কমিশনকে এই ৬৫ লক্ষ নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। নাম বাদ যাওয়া যে কোনো বৈধ ভোটার আইন মেনে, তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে আবেদন করতে পারবেন।

সুপ্রিম কোর্টে পরে শুনানির সময়, কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী আদালতে একটি রিপোর্ট জমা দেন। কিন্তু সেই রিপোর্ট দেখেই সুপ্রিম কোর্ট বিস্মিত। রাজনৈতিক দলগুলির মোট ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৮১৩ জন বিএলএ, ২২ দিনে মোট ২ জন ভোটারের নাম তুলতে আবেদন জানিয়েছে। আর কমিশনের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ৮৪ হাজার ৩০৫ জন সাধারণ মানুষ তাঁদের নাম বাদে আপত্তি জানিয়ে আবেদন করেছেন।

> **ভারতীয় নাগরিক নন, এমন কারও নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না। আর আধার আইন বলছে, আধার একটি পরিচয়পত্র কিন্তু নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নয়।**

নাম বাদ যাওয়া ৬৫ লক্ষের মধ্যে ৮৪ হাজার মানে ১.৩ শতাংশ। স্বাধীনতার পর দেশে যত ভোট হয়েছে, যত ভোটার তালিকা সংশোধন হয়েছে, তাতে মার্জিন অফ এরর বা ভুলের সম্ভাবনা ছিল মোটামুটিভাবে ৪ থেকে ৫ শতাংশ। সেই তুলনায় ১.৩ শতাংশ অনেকটাই কম। আদালত বলেছে, বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে, নাম তোলার আবেদনপত্রের সঙ্গে তিনি আধারের প্রতিলিপি জমা দিতে পারেন। কিন্তু এটা বলেনি যে, আধার জমা দিলেই ভোটার তালিকায় নাম উঠে যাবে। আসলে সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিতেই পারবে না। কারণ, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৬ নম্বর ধারা বলছে, ভোটার তালিকায় তাঁর নামই থাকবে, যিনি ভারতের নাগরিক। মানে খুব সোজা। ভারতীয় নাগরিক নন, এমন কারও নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না। আর আধার আইন বলছে, আধার একটি পরিচয়পত্র কিন্তু নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নয়। বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি আগেই সেটা মেনে নিয়েছেন। ফলে আধার স্বীকৃত বলে সেই বেঞ্চই কী করে স্ববিরোধী নির্দেশ দেবে? আদালতকে তেমন নির্দেশ দিতে হলে তো আগে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৬ ধারা আর আধার আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে হবে।

অতএব দিদি, মিথ্যে প্রচারে লাভ নেই। এখন থেকে আগামী সব নির্বাচনে অংশ নেবেন শুধু ভারতের নাগরিকরা। বিদেশিরা নন। □

অতিথি কলম

দেশ কাপুর

কৌশলগত ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে দৃঢ়প্রত্যয়ী সংগ্রাম

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর থেকে অতীতের যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্বভরা নীতি ত্যাগ করে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছে ভারত। এই প্রথমবার বিশ্বের পাঁচটি প্রধান শক্তি— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত ও রাশিয়ার দ্বারা আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত হচ্ছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। বহুমেরু বিশ্বে অন্যতম ও অপরিহার্য মেরুশক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছে ভারত। বর্তমান বিশ্ব ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভারতের ভূমিকা সত্যিই অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন নীতির সঙ্গে প্রায়শই সহমতি পোষণ করে থাকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তাদের এই সহাবস্থানের দরুন বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের স্বাধীন ও স্বকীয় অবস্থান আরও বেশি মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সীমান্ত পেরিয়ে সামরিক পদক্ষেপ : ভারতের দৃঢ়চেতা মনোভাবের লক্ষণগুলি নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের শুরু থেকেই নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হতে থাকে। সন্ত্রাসবাদ দমনের লক্ষ্যে সীমান্তের বাইরে পা রাখে ভারতীয় সেনা। জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে সাহসী সামরিক অভিযানের মাধ্যমে বার্তা দেয় নতুন ভারত। ২০১৫ সালের জুন মাসে মায়ানমার সীমান্ত অতিক্রম করে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করে একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

পাক সন্ত্রাসবাদ দমনে সার্জিকাল স্ট্রাইক : সর্বোৎকৃষ্ট সার্জিকাল স্ট্রাইকটি সম্ভবত পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হয়েছে। পাক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে নানা আচরণ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করেছে ভারত। বড়ো মাপের সন্ত্রাসবাদী হামলার পর সন্ত্রাস দমনে ভারত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে, জম্মু-কাশ্মীরের উরি সেক্টরের একটি সেনাঘাঁটিতে ভয়াবহ হামলা চালায় পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা। এই হামলায় ১৮ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। এই ঘটনার জবাব দিতে প্রত্যাঘাত করে ভারত। সুপরিকল্পিত উপায়ে লাইন অফ কন্ট্রোল (এলওসি) বা নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' চালায় ভারতীয় সেনা। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক 'টেররিস্ট লঞ্চ প্যাড' বা সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে হানা দেয় ভারতীয় প্যারাট্রুপার বা প্যারাশ্যুটধারী সৈনিকরা। সাম্প্রতিক ইতিহাসে, সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে এহেন পদক্ষেপ সত্যিই নজিরবিহীন। সেনা অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর ভারত সরকার ঘোষণা করে যে, উরি হামলার জন্য দায়ী জঙ্গিরাই ছিল ভারতের টার্গেট। তাদের নিকেশ করার লক্ষ্যেই এলওসি পেরিয়ে সার্জিকাল স্ট্রাইক পরিচালিত হয়েছে বলে জানায় ভারত।

দ্রুত প্রত্যাঘাত : ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় একটি আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের ফলে নিহত হন ভারতীয় আধাসামরিক বাহিনীর ৪০ জন জওয়ান। পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ এই ঘটনার দায় স্বীকার করে। এর প্রতিশোধ নিতে পাক ভূখণ্ডের অনেক ভিতরে বিমান হামলা চালায় ভারত। ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পর এই প্রথমবার পাকিস্তানে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে ভারতীয় বিমান বাহিনী। কেবল পাক-সন্ত্রাসবাদ দমনেই সীমাবদ্ধ ছিল না ভারতের দৃঢ়চেতা মনোভাব। চীনের আগ্রাসী মনোভাব এবং ভারতীয় ভূখণ্ডে চীনা অনুপ্রবেশের প্রয়াসের ফলে সৃষ্টি হয় ডোকলাম অচলাবস্থা, ঘটে যায় গালওয়ানের ঘটনা। ডোকলাম ও গালওয়ান ইস্যুতে চীনের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতীয় দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কৌশলগত ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে নয়া নীতি বা সামরিক দর্শন : মোদীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় দৃঢ়তার অন্যতম স্তম্ভ হলো পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'কৌশলগত স্বাধিকার'-এর বিষয়টির পুনরাবিষ্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কৌশলগত ক্ষেত্রে ভারত প্রণীত কূটনৈতিক ও সামরিক দর্শনটি পক্ষান্তরে ভারতীয় বিদেশনীতিকেই পুনরুজ্জীবিত করেছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলাকালীন তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে 'নন-অ্যালাইনড্ মুভমেন্ট' বা 'নির্জোট আন্দোলন'। আমেরিকা বা সোভিয়েত ইউনিয়ন— কোনো বৃহৎ শক্তির শিবিরে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে শ্লাঘাবোধ করত ভারত। সেই সময় কোনো জোটে যোগ না দিলেও ঠাণ্ডা যুদ্ধের শেষদিকে ভারত অনেকটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আবার ১৯৯১ সালের পরে নানা বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ অবলম্বন করে ভারত। সময়ের সঙ্গে রাশিয়া এবং তারপর অবস্থান পালটে আমেরিকার দিকে ঝুঁকলেও 'জোটনিরপেক্ষতা'র নীতি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও সরে আসেনি ভারত।

নরেন্দ্র মোদীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বে প্রকাশিত হয়েছে স্বাধীন ও স্বনির্ভর ভারতের একটি স্পষ্টতর রূপ। আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছপা হয়নি এই নতুন ভারত। জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে সকল আন্তর্জাতিক শক্তির একত্রীকরণে জোর দিয়েছে ভারত। গুরুত্বপূর্ণ সব পক্ষকে একজোট করার মাধ্যমে একদা গৃহীত 'নন-অ্যালাইনড্' অবস্থান থেকে 'মাল্টি-অ্যালাইনমেন্ট' অবস্থানে চলে গিয়েছে বর্তমান ভারত। অর্থাৎ একই সঙ্গে একাধিক জোটে অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছে ভারত।

ভারতের এহেন অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে সাহসী মনোভাব। সব ক্ষেত্রেই ভারত তার নিজস্ব স্বার্থরক্ষা করেছে। পশ্চিমি শক্তির প্রভাবান্বিত বিভিন্ন দেশের জোট বা কোনো একক শক্তির নেতৃত্বাধীন কোনো ব্লক থেকে যখনই ভারত নিজেকে পৃথক করেছে, তখনই রীতিমতো

দ্বিধাহীনভাবে তা করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কৌশলী সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছপা হয়নি আজকের ভারত।

উদাহরণস্বরূপ আলোচিত হতে পারে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানের বিষয়টি। ২০২২ সাল থেকে শুরু হয়ে এখনও চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সেই যুদ্ধ জারি রাখার কারণে রাশিয়াকে কোণঠাসা করার নীতি গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে অস্বীকৃত হয় ভারত। এর পরিবর্তে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখে নয়াদিল্লি। রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আনা মার্কিন 'নিন্দা প্রস্তাব'-এর ক্ষেত্রে প্রতিবার ভোটাভুটিতে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা। এছাড়াও মস্কোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখে নয়াদিল্লি। রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষাগত লেন-দেনও অব্যাহত রাখে ভারত। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে খনিজ তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতকে আর্থিক ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দেয় রাশিয়া। দেশীয় মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভারতও রাশিয়ান তেল আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ভারতীয় নীতিসমূহ কিন্তু রাশিয়ার পক্ষ থেকে ঘোষিত যুদ্ধে সিলমোহর দান অথবা রাশিয়া-ইউক্রেন— বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করার পরিচায়ক মোটেই নয়। বরং এই নীতি আন্তর্জাতিক স্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বার্তা বহন করছে। কৌশলগত ক্ষেত্রে লাভ-ক্ষতির চুলচেরা হিসাব ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছে ভারতীয় নীতি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বহু দশক ধরে ভারতের সঙ্গী দেশ হলো রাশিয়া। ভারতকে অস্ত্রসরবরাহকারী দেশগুলির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই প্রধান ভূমিকায় রয়েছে রাশিয়া। বর্তমানে তার ১৪০ কোটি মানুষের জন্য সুলভ মূল্যে জ্বালানি প্রয়োজন ভারতের। এই আবহে দাঁড়িয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস. জয়শঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইউরোপের সমস্যাগুলি বিশ্বের সমস্যা, কিন্তু বিশ্বের সমস্যাগুলি ইউরোপের সমস্যা নয়— এহেন ভাবনাচিন্তা বা মানসিকতা থেকে ইউরোপকে বেরিয়ে আসতে হবে।'

'গ্লোবাল সাউথ'-এর নেতৃত্বদান : ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতের উত্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'গ্লোবাল সাউথ'-এর প্রধান কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার সচেতন প্রয়াস। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং সাউথ প্যাসিফিক বা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি নিয়ে গঠিত এই গ্লোবাল সাউথ, বা 'আন্তর্জাতিক দক্ষিণ'। সফলভাবে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলির নেতৃত্বদান করে চলেছে ভারত।

তথ্য-প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থায়নে গ্লোবাল সাউথের অন্তর্গত দেশগুলির সমানাধিকারের বিষয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে ভারত। ছোটো ছোটো দেশগুলির প্রতি ভারত প্রসারিত করেছে সাহায্য ও সমর্থনের হাত। তাদেরকে সহায়তা দানের ফলে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশগুলির সীমা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে ভারত।

গত কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির দাবিতে মুখর হয়েছে ভারত। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কার এবং সেখানে অন্যান্য দেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টির ওপর ধারাবাহিকভাবে সওয়াল করে আসছে ভারত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ, বিশেষত নিরাপত্তা পরিষদকে পুনর্গঠনের আহ্বান জোরালোভাবে জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। ভারত-সহ বিশ্বের অন্যান্য উদীয়মান শক্তিগুলি যাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে সেই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য যুক্তি-সহ উপস্থাপন করেছেন তিনি। এই বিষয়ে মোদীজীর বক্তব্য হলো আন্তর্জাতিক স্তরে যাবতীয় বিচার- বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখনও বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গৃহীত কিছু নীতি ও আইন-কানুনে আটকে রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই ব্যবস্থা সত্যিই বেমানান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় একবিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক বাস্তবতা প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন নতুন জোট গঠন : মোদীজীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারত তার কৌশলগত নীতিগুলিকে কিছুটা পরিমার্জন করেছে। আন্তর্জাতিক জোটে অবস্থানের বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে গৃহীত নীতিসমূহও নানাভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। 'ইন্দো-প্যাসিফিক রিজিয়ন' বা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রেক্ষিতে এই অঞ্চলে নিজস্ব প্রভাব ধরে রাখার লক্ষ্যে ভারতের পক্ষ থেকে এই নীতি পুনর্বিবেচনার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

পরম্পরাগতভাবে, বৃহৎ শক্তির অধীনে কোনো আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বা সামরিক জোট গঠনের বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে থাকে ভারত। অন্য কোনো দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম না করা বা সেই দেশের ওপর ছড়ি ঘোরানোর ব্যাপারে যুক্ত না থাকা হলো ভারতের স্থায়ী বিদেশনীতির অংশ। এই বিষয়ে সদা সতর্ক থাকে ভারত। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একত্রে 'কোয়াড্রিল্যাটেরাল সিকিউরিটি ডায়ালগ' বা কোয়াড- নামক একটি গোষ্ঠীতে যোগদান করেছে ভারত। অতীতের দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থান এবং নানা অনিচ্ছা ত্যাগ করে কোয়াডের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে ভারত। ২০১৯ থেকে ২০২১-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নেতৃত্ব-সংবলিত হওয়ার কারণে 'শিখর সম্মেলন'-এর স্তরে উন্নীত হয়েছে 'কোয়াড'। কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে বিভিন্ন সময় মোদীজী সশরীরে উপস্থিত থেকেছেন। কখনও-বা এই সম্মেলনে তাঁর ভার্চুয়াল উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছে সমগ্র বিশ্ব।

সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণ : বিগত এক দশকে বিশ্বজুড়ে ভারত তার দৃঢ় কূটনীতির উদাহরণ উপস্থাপন করেছে। এই দৃঢ় কূটনীতির মূল ভিত্তি হলো নিজস্ব সামরিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতাবৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক মহলে কোনো কূটনৈতিক সংঘাত, কোনো আলাপ-আলোচনা বা কোনো বোঝাপড়া কঠিনতম পর্যায়ে উপনীত হলে আত্মপক্ষ সমর্থনের স্বার্থে আগে থেকেই নিজেকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী একটি পক্ষ হিসেবে প্রতিপন্ন করাটাই যেকোনো উদীয়মান শক্তির ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ। আর ঠিক সেই কাজটিই অনবরত করে চলেছে বর্তমান ভারত। নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বে ব্যাপক বিনিয়োগের ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ সংঘটিত হয়েছে। ভারতের পক্ষে কৌশলগত ক্ষেত্রে নতুন কর্মসূচি গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর মিশনগুলি সফলভাবে রূপায়িত হওয়ার ফলে এই ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি সর্বসমক্ষে দৃশ্যমান হয়েছে। প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত ক্ষেত্রে উন্নতি ত্বরান্বিত হওয়ার ফলে বৃহৎ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের আবির্ভাব এবং সেখানে স্থানাধিকারের স্পষ্ট ইঙ্গিতও ইতিমধ্যেই বিদ্যমান। স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারত নিজেকে একটি ক্ষমতাধর দেশ হিসেবে বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করছে। আগামীদিনে ভারতের এহেন অবস্থানকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে সমগ্র বিশ্ব।

(লেখক একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-নিবাসী, বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)

রাজ্য সরকারের অপশাসন বাঙ্গালির শিক্ষার সর্বনাশ নিশ্চিত করেছে

১৯৬৭-তে চারু মজুমদার সবাইকে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বলেন। তাঁর মত ছিল যে, এই শিক্ষাব্যবস্থাটা হলো একটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল। সেই সময় কয়েক বছর নৈরাজ্য চলার পর ১৯৭২-৭৩ সালে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। এরই মাঝে একজন উপাচার্যকে প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর তাঁর অতিবাম সমর্থকরা কেউ দেশ ছাড়েন; ধীরে ধীরে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা শেষ করে দেওয়ার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যে কেউ-বা সিস্টেমে মিশে যান। আজ চারু মজুমদারের মৃত্যুর অর্ধশতক পর যখন রাজ্যের স্নাতকস্তরের দুই-তৃতীয়াংশ আসন খালি থাকে, তখন এটা বুঝে নিতে হয় যে চারু মজুমদারের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। ১৯৭০-এ সফল না হলেও, আজ ২০২৫-এ চারু মজুমদারের অনুগামীরা সিস্টেমের মধ্যে থেকে এমন সব অন্তর্ঘাত করে চলেছে যে, আজকের যুবসমাজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভরসা হারিয়েছে। হতে পারে পশ্চিমবঙ্গ একটা গিনিপিগ, যার ওপর চলছে নানারকম ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা নিরীক্ষা। আগামীদিনে অন্যান্য রাজ্যেও হয়তো এর প্রয়োগ হতে পারে।

গত ১৪ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গবাসী সাক্ষী রয়েছে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়— প্রতিটি স্তরে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির। এছাড়াও, স্কুল কমিটি রাজনৈতিক বাহুবলীদের হাতে তুলে দেওয়া, টেন্ডার দুর্নীতি, শিশুদের খাদ্য চুরি বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে যে, রাজ্যের প্রায় দশ হাজারের কাছাকাছি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর সঙ্গে পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন না বাড়ানো, তাঁদের প্রতি প্রশাসনের বিমাতৃসুলভ আচরণ ও দুর্ব্যবহারের কারণে পরিবেশ হয়েছে আরও খারাপ। একজন স্থায়ী শিক্ষকের বেতনের ২০ শতাংশ হলো একজন পার্শ্বশিক্ষকের বেতন। একদিকে অযোগ্য লোকজন ঘুষ দিয়ে স্থায়ী চাকুরে হয়ে যখন স্কুলে আসছেন, তখন যোগ্য পার্শ্বশিক্ষকরা অযোগ্য, স্থায়ী শিক্ষকদের থেকে এতটা কম মাইনে নিয়ে কীভাবে সেখানে কাজ করবেন?

রাজ্য সরকার-পোষিত কলেজগুলির অবস্থা তো আরও খারাপ। কলেজগুলিতে বহু বছর ধরে স্থায়ী শিক্ষক বা অধ্যাপক নিয়োগ বন্ধ। একজন স্থায়ী অধ্যাপকের বেতনের ২০ শতাংশ বেতন পান একজন পশ্চিমবঙ্গের একজন অস্থায়ী কলেজ শিক্ষক বা স্টেট-এইডেড কলেজ টিচার। কিছু শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে সেই মাইনেতে কলেজগুলিতে অস্থায়ী পদে নিয়োজিত হচ্ছে। তারা এইসব কাজে যোগ দিলেও নেট, সেট পাশ করে এক দশকের বেশি সময় ধরে বাড়িতে বসে রয়েছেন যোগ্য প্রার্থীরা। কলেজগুলির বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ের ল্যাবরেটরিগুলি পুরনো। নতুন ল্যাবরেটরির জন্য কলেজগুলির কাছে অর্থের সংস্থান নেই। অন্যদিকে চার বছরের গ্র্যাজুয়েশন কোর্স চালু হয়েছে। এখন সব মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ করে কী করবেন সেই ভেবে তাঁরা এবং তাঁদের অভিভাবকরা হয়ে পড়ছেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়! যার ফলে এই বছর রাজ্যের কলেজগুলিতে ৬৬ শতাংশ আসন খালি। গত ২৭ এপ্রিল পরীক্ষা গ্রহণের প্রায় চার মাস পর গত ২২ আগস্ট প্রকাশিত হয় রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলাফল।

এর মধ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে রাজ্য সরকার প্রায় তিন-চার মাস দেরি করে ফেলল। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে নির্লজ্জভাবে মুসলমান তোষণ করার জন্য এই কাজ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই রাজ্যে ওবিসি-এ এবং ওবিসি-বি মিলিয়ে যে ১৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা ২০১০ সালে চালু হয়েছিল, সম্প্রতি তা খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য আবার গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সর্বোচ্চ আদালতের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে সাময়িক ছাড় পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিকের ফল বেরোনোর তিন-চার মাস পর ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি এবং স্নাতক স্তরের ভর্তি যখন শুরু করেছে রাজ্য, তখন অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী হয় চলে গিয়েছে দক্ষিণ ভারতে, কিংবা বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। যাঁদের সেরকম অর্থের জোর নেই, তাঁদের অনেকেই লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

ছাত্র ভর্তি বন্ধ রাখার ব্যাপারে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে রাজ্যের দেওয়া যুক্তি হলো রাজ্য সরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১৭ শতাংশ আসন ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় থাকার কথা। সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায় না আসা পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি করলে ভবিষ্যতে ফের আইনি জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্য। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট একাধিক মামলায় স্পষ্ট জানিয়েছে যে ২০১০ সালের ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল হওয়ার কারণে তার আগে বলবৎ থাকা ৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের নীতি অনুসরণ করে চলতে পারে রাজ্য। সেই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টেরও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেই নিয়ম মেনে ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলেও মুসলমান তোষণ নীতি থেকে সরতে নারাজ রাজ্য সরকার। ১০ শতাংশ আসনে ওবিসি সংরক্ষণের ইস্যুতে অনড় থেকে বাকি ৯০ শতাংশ আসনে ভর্তির প্রক্রিয়া রুদ্ধ করে নবান্ন। ১০ শতাংশ মুসলমানকে সরকারি দাক্ষিণ্য পাইয়ে দেওয়ার খেলায় নেমে ৯০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখছে রাজ্য সরকার। রাজ্য দেরি করে ভর্তি করার ফলে প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষার আগে পড়াশোনা বা প্রস্তুতির সেরকম সুযোগও পাবে না ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজ্যের সুশীল সমাজ এই ব্যাপারে কিন্তু নির্বিকার। রাজ্যের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমও নির্বিকার। রাজ্যের তথাকথিত প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ গাজা নিয়ে যেটুকু চিন্তা করে, তার ১ শতাংশ করে না পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা নিয়ে। রাজ্যের শিক্ষক সমাজও চুপ। স্কুলগুলির যে ২৬,০০০ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী চাকরি হারিয়েছেন, তাঁরাও ভয়ে আর প্রতিবাদ করছেন না। বাঙ্গালির শিক্ষার হাল যে এইরকম হবে সেই স্বপ্ন কি দেখেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দরা? অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙ্গালির সার্বিক জাগরণ প্রয়োজন। শিক্ষাই তো বাঙ্গালি জাতির শেষ পুঁজি। শিক্ষাহীন বাঙ্গালি যে মণিহারা ফণী। □

সিএএ যথেষ্ট নয় : বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য চাই 'হিন্দু ল অব রিটার্ন' আইন প্রণয়ন

সাধন কুমার পাল

গত ১৬ আগস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠার খবর। শিরোনাম ছিল, ভোটার তালিকায় 'বাংলাদেশি' পরিবার। অভিযোগ, ক্ষিতীশ ঋষি নামে ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছেন। নিজের পরিবারের সদস্যদেরও এদেশে এনে স্থায়ীভাবে বসিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, তিনি ভোটার তালিকায় নাম তোলা থেকে শুরু করে আধার, র‍্যাশন ও প্যান কার্ড পর্যন্ত তৈরি করিয়ে নিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্ষিতীশ প্রথমে স্ত্রীকে নিয়ে এসে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে ছেলে ও মেয়েকেও বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসেন। ২০২৩ সালে ক্ষিতীশের নাম ভোটার তালিকায় ওঠে। ২০২৫ সালে তাঁর ছেলে ও মেয়ের নাম ভোটার তালিকায় ওঠে। তবে স্ত্রী এখনো ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারেননি। পরিবারের সদস্যদের নামে অন্যান্য সরকারি নথি যেমন আধার কার্ড, র‍্যাশন কার্ড এবং প্যান কার্ড তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বামপন্থী কৃষ্ণকান্ত রায় প্রশাসনকে লিখিতভাবে এই পরিবার অবৈধভাবে বসবাস করছে বলে অভিযোগ করেন।

বাংলাদেশের নাগরিক কি না, এমন প্রশ্নে তিনি স্বীকার করেন, হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশ থেকে এসে এসেছি। যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন আমার বাবা-মা ও শ্বশুর-শাশুড়ি খান সেনাদের (পাকিস্তান সেনা) গুলিতে মারা যান। আমি স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে আসি। পরে আবার দেশে ফিরে যাই। কিন্তু অত্যাচারের কারণে বেশিদিন থাকতে পারিনি। ছেলেকে নিয়ে আবার ভারতে চলে আসি। মুসলমান অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখে কুলুপ এটে থাকলেও বামপন্থী কৃষ্ণকান্তের মতো তৃণমূলে ও মিডিয়াতেও আত্মঘাতী হিন্দুরা রয়েছে এই অসহায় উদ্বাস্তুদের অন্তিম আশ্রয় থেকে উৎখাত করার জন্য। পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে এই ক্ষিতীশরা ছড়িয়ে রয়েছেন যারা তাদের শেষ আশ্রয় ভারতে থেকেও সপরিবারে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কায় দিন গুনছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে জন্মানোই বাঙ্গালি হিন্দুর অভিশাপ। ভারত বিভাজনের সময় পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের জন্ম হিন্দুদের জন্য এক মহা অভিশাপ হয়ে এসেছে। সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিজ দেশেই নির্যাতিত, জমি-সম্পত্তিহারা, ধর্মান্তরণ এবং মেয়েরা বলপূর্বক অপহরণের শিকার। কিন্তু যখনই তারা ভারতে আশ্রয় চায়, তখনই প্রশ্ন ওঠে— 'তোমাদের পূর্বপুরুষের নথি কোথায়?'

ইজরায়েলের মতো 'The Law of Return' আইন প্রয়োজন।

ইজরায়েল ইহুদিদের জন্য 'ল অব রিটার্ন' আইন করেছে, যেখানে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের ইহুদি নথি ছাড়াই ইজরায়েলে নাগরিকত্ব পেতে পারে। কিন্তু হিন্দুদের জন্য এমন কোনো আইন নেই। ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এ লক্ষাধিক বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থী হয়ে ভারতে এলেও তাদের নাগরিকত্ব আজও অনিশ্চিত।

১৯৪৭-এ পকিস্তান সৃষ্টি : পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। জমি দখল, জিজিয়া কর, ধর্মীয় হামলা শুরু হয়। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার কমেনি। ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ, জমি দখল, মন্দির ভাঙচুর এখনো চলছে।

জনসংখ্যা হ্রাস : ১৯৪৭-এ পূর্ববঙ্গে হিন্দু ছিল ৩০ শতাংশ, এখন মাত্র ৭ শতাংশ।

কেন এই ধরনের আইন প্রয়োজন?

১. **নথিহীন শরণার্থীদের অধিকার :** ১৯৭১-এ অনেক হিন্দু নথি ছাড়াই ভারতে এসেছে। তাদের নাগরিকত্ব দিতে এই আইন প্রয়োজন।

২. **ধর্মীয় নির্যাতন থেকে মুক্তি :** বাংলাদেশ-পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ, নারীদের অপহরণ চলছে। ভারতে আশ্রয় তাদের অধিকার।

৩. **ইতিহাসের ঋণ শোধ :** ভারত বিভাজনের সময় হিন্দুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের পুনর্বাসন দেশের দায়িত্ব। ইজরায়েলের মতো 'হিন্দু ল অব রিটার্ন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে বাংলাদেশ-পাকিস্তান থেকে আসা যেকোনো হিন্দুকে স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) একটি ভালো শুরু, কিন্তু তা শুধুমাত্র ২০১৪ সাল পর্যন্ত শরণার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে। এই আইনের সময়সীমা বাড়ানো প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা হিন্দুদের নির্যাতনের বিষয় তুলে ধরে কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। হিন্দু বাঙ্গালিদের সুরক্ষায় 'ল অব রিটার্ন'-এর আদলে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা। ভারতবর্ষ বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে শত শত বছর ধরে হিন্দু ধর্ম ও বাঙ্গালি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর

ল' অব রিটার্ন আইনটি ইজরায়েল দেশের অস্তিত্বের অন্যতম মূল স্তম্ভ। এটি পৃথিবীর সমস্ত ইহুদি জাতির জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করে, যাতে কোনো দেশ বা অঞ্চলে নিপীড়ন বা বিপদের মুখে পড়লে তারা ইজরায়েলে এসে নিজের মাতভূমিতে বসবাস করতে পারেন।

ফ ঃ ২

দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও প্রতিবেশী দেশগুলিতে (বিশেষত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান) সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালি হিন্দুকে তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

২০১৯ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন বা সিএএ কিছুটা সুরক্ষা দিলেও, এর কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আজও হিন্দু বাঙ্গালিদের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির পথে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিএএ আইনের প্রধান সীমাবদ্ধতা : তারিখের বাধা— শুধুমাত্র ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪-এর মধ্যে ভারতে প্রবেশ করা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টানরা এই আইনের সুবিধা পাবেন।

এর ফলে ২০১৪ সালের পরে যারা বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারের কারণে এসেছেন, তারা বাদ পড়ে যাচ্ছেন। প্রমাণপত্রের জটিলতা— ২০১৪ সালের আগে যারা এসেছেন, তাদেরও অনেকের কাছে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বা বাসস্থানের সরকারি প্রমাণ নেই, ফলে তারা নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারছেন না।

প্রশাসনিক বিলম্ব— অনেক রাজ্যে রাজনৈতিক বা আমলাতান্ত্রিক কারণে আবেদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে।

ইজরায়েলের ল' অব রিটার্ন : একটি কার্যকর মডেল : ইজরায়েল ১৯৫০ সালে ল' অব রিটার্ন আইন প্রণয়ন করে, যার মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে থাকা ইহুদিরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজরায়েলে এসে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার পায়। এই আইনে তারিখের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। প্রমাণের জন্য কেবল ইহুদি পরিচয়ের ভিত্তি থাকলেই যথেষ্ট।

এটি জাতি ও ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে একটি নিরাপত্তা নীতি, যা ইহুদিদের সুরক্ষা দেয়। ভারতে হিন্দু বাঙ্গালিদের জন্য একই ধরনের আইন কেন প্রয়োজন ঐতিহাসিক দায়িত্ব বাঙ্গালি হিন্দুরা ভারতীয় সভ্যতা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। দেশ ভাগ ও তারপরে বারবার নির্যাতনের শিকার হয়ে তারা ভারতে এসে নিয়েছেন, যা নৈতিকভাবে ভারত সরকারের রক্ষা করা উচিত।

জাতিগত ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষা : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শহরে হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তারা যদি ভারতেও সুরক্ষাহীন থাকে, তবে একসময় হিন্দু বাঙ্গালি সংস্কৃতি অস্তিত্ব সংকটে পড়বে।

সিএএ-র সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ : তারিখের শর্ত তুলে দিলে ২০১৪ সালের পরে আসা সমস্ত অত্যাচারিত হিন্দু বাঙ্গালিরাও নাগরিকত্ব পাবেন। জন্ম বা মাতৃভূমির প্রমাণ না থাকলেও জাতিগত পরিচয় ভিত্তি হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, যেমন ইজরায়েল করে থাকে।

প্রস্তবিত 'ল' অব রিটার্ন ফর বেঙ্গলি হিন্দুজ' আইনের কাঠামো যোগ্যতা : যেকোনো হিন্দু বাঙ্গালি, যিনি বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে বাস করেন, ভারতবর্ষ এসে নাগরিকত্বের আবেদন করতে পারবেন।

তারিখের সীমা নেই : যে বছরই আসুন না কেন, নাগরিকত্বের অধিকার থাকবে। পরিবারের অন্তর্ভুক্তি : স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, নাতি-নাতনিরাও অন্তর্ভু হবেন।

তারিখের প্রক্রিয়া : ৬ মাসের মধ্যে নাগরিকত্ব প্রদান।

জাতীয় সুরক্ষা ধারা : শুধুমাত্র গুরুতর অপরাধ বা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বাদ পড়বেন। ইজরায়েলের ল' অব রিটার্ন আইনটি প্রমাণ করেছে যে জাতি ও ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে মাতৃভূমিতে নাগরিকত্ব দেওয়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হতে পারে। ভারত যদি হিন্দু বাঙ্গালিদের জন্য অনুরূপ আইন প্রণয়ন করে, তবে শুধু সংবিধানের নৈতিক দায়িত্বই পূর্ণ হবে না, বরং একটি সংকটাপন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বও রক্ষা পাবে। এটি হবে মানবিকতা, ইতিহাস ও ন্যায়বিচারের মিলিত প্রতিফলন।

ল' অব রিটার্ন, ইজরায়েল, প্রণয়ন সাল : ১৯৫০ (পরে কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে— ১৯৭০ সালে বড়ো সংশোধন হয়)।

১. **উদ্দেশ্য :** এই আইনটি ইজরায়েলের মূল আদর্শ 'ইহুদিদের জন্য মাতৃভূমি' ধারণাকে আইনি রূপ দিয়েছে। ইহুদি জনগোষ্ঠী পৃথিবীর যেকোনো দেশে থাকুক না কেন, তারা চাইলে ইজরায়েলে ফিরে এসে বসবাস করতে এবং নাগরিকত্ব পেতে পারে— এই নীতিই এই আইনের ভিত্তি।

২. **প্রধান ধারাগুলি :** অধিকারভিত্তিক অভিবাসন (Aliyah) :

যে কোনো ইহুদি ব্যক্তি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে ইজরায়েলে এসে স্থায়ী হতে চাইলে, তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। আবেদন করার পর সাধারণত কয়েক মাসের মধ্যে নাগরিকত্ব মঞ্জুর হয়। কে 'ইহুদি' হিসেবে গণ্য হবেন যার মা ইহুদি অথবা, যে ব্যক্তি ইহুদি মতে দীক্ষিত হয়েছেন (conversion to Judaism) এবং অন্য কোনো মতে দীক্ষিত হননি। পরিবার-সংশ্লিষ্ট অধিকার ইহুদি ব্যক্তির স্ত্রী/স্বামী ইহুদি ব্যক্তির সন্তান ও নাতি-নাতনি তাদের স্বামী/স্ত্রী, এই পরিবার সদস্যরাও ল' অব রিটার্ন আইনের অধীনে নাগরিকত্ব পেতে পারেন, যদিও তারা নিজেরা ইহুদি নাও হতে পারেন।

নাগরিকত্বের প্রক্রিয়া : অভিবাসন প্রক্রিয়াকে হিব্রু ভাষায় বলে 'আলিয়াহ'। আবেদনকারীকে প্রমাণ দিতে হয় যে তিনি/তিনি বা তার পূর্বপুরুষ ইহুদি। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাইয়ের পর তাকে ইজরায়েলে স্থায়ী বসবাসের অধিকার ও নাগবিকত্ব দেওয়া হয়।

৩. **সীমাবদ্ধতা :** ল' অব রিটার্ন আইন অনুযায়ী, নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকৃতি জানানো যেতে পারে যদি আমেবদনকারী ইজরায়েলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হন।

আবেদনকারী অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন এবংল গুরুতর অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হন। আবেদনকারী জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হন।

৪. **১৯৭০ সালের সংশোধনী :** ১৯৭০ সালের সংশোধনীতে 'ইহুদি' শব্দের সংজ্ঞা স্পষ্ট করা হয়; যে ব্যক্তি ইহুদি পরিবারে জন্মেছেন এবং অন্য কোনো মতে দীক্ষিত হননি। ধর্মান্তরিত ইহুদিরাও নাগরিকত্ব পেতে পারেন যদি তারা ইহুদি মতে দীক্ষিত হয়ে থাকেন এবং অন্য কোনো মতে দীক্ষিত না হন। নাতি-নাতনি পর্যন্ত রক্তসম্পর্কে নাগরিকত্বের যোগ্যতা বিবেচিত হয়।

৫. **অন্যান্য দেশের সঙ্গে পার্থক্য :** অধিকাংশ দেশে নাগরিকত্ব জন্মস্থান বা দীর্ঘকাল বসবাসের উপর ভিত্তি করে হয়। কিন্তু ইজরায়েলের ল' অব রিটার্ন জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়কে ভিত্তি করে তৈরি। এর ফলে, বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশে জন্মানো ইহুদিরা নাগরিকত্বের অধিকার পায়, যদিও তারা আগে কখনো ইজরায়েলে বসবাস না করে থাকেন।

ল' অব রিটার্ন আইনটি ইজরায়েল দেশের অস্তিত্বের অন্যতম মূল স্তম্ভ। এটি পৃথিবীর সমস্ত ইহুদি জাতির জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করে, যাতে কোনো দেশ বা অঞ্চলে নিপীড়ন বা বিপদের মুখে পড়লে তারা ইজরায়েলে এসে নিজের মাতভূমিতে বসবাস করতে পারেন। ▯

রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণের অজুহাতে ছাত্র ভর্তি বন্ধ রাখা সংখ্যালঘু তোষণের নির্লজ্জ প্রয়াস

আনন্দ মোহন দাস

রাজ্য সরকারের সার্বিক ব্যর্থতার মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম দুরবস্থা পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আজ অনিশ্চিয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের বারোটা বাজিয়ে ভাতা সর্বস্ব রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়ে বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ অন্ধকার করা হয়েছে। রাজ্যে শাসকদলের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলিকে কলুষিত করা হয়েছে। রাজ্যের সরকার ভোট ও ভাতা কেন্দ্রিক হয়ে সমাজের মূল স্তম্ভগুলিকে ভাঙার খেলায় মেতে উঠেছে। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধন করে থাকে। কিন্তু সেই শিক্ষাকে ব্রাত্য করে জনগণকে অন্ধকারে রাখাই সমীচীন বলে শাসকদল শ্রেয় মনে করছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্র এতো অবহেলিত। কারণ শাসক জানে, মেরুদণ্ডহীন মানুষ তৈরি করার জন্য শিক্ষার দরকার হয় না। তাই শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই মূলমন্ত্র।

বিগত দুই দশকে কেবলমাত্র রাজনীতির কারণে, শিক্ষাক্ষেত্রে সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ আজ পিছনের সারিতে চলে গেছে। অথচ পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার ও ওড়িশা শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক এগিয়ে গেছে। যে শিক্ষার মাধ্যমে জাতির মেরুদণ্ড নির্মাণ হয়, রাজ্যের শাসক দলের প্রচেষ্টায় তারই অন্তর্জলিযাত্রা শুরু হয়েছে। শাসকের মদতে শিক্ষকের মতো মহৎ পেশা আজ দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত হয়েছে। শিক্ষার জায়গায় দুর্নীতির ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দুর্নীতির দায়ে রাজ্যের স্কুলগুলির ২৬ হাজার শিক্ষক অশিক্ষক কর্মীর চাকরি চলে গেছে। শাসকদল টাকার বিনিময়ে অযোগ্য শিক্ষকদের বাঁচাতে যোগ্য শিক্ষকদের বলি চড়িয়েছে। তাই সবকিছু এলোমেলো করার জন্য এসএসসি ও রাজ্য সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা না রেখে পরীক্ষার ওএমআর শিট ও তার মিরর ইমেজ সংরক্ষণ করেনি। তার ফলশ্রুতিতে সর্বোচ্চ আদালত যোগ্য অযোগ্যের বেড়াজালে দুর্নীতির কারণে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করেছে।

রাজ্য সরকার ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে নতুন কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থাপনের অভাবে রাজ্যের দায়ের করা রিভিউ পিটিশনও সর্বোচ্চ আদালত খারিজ করেছে। কারণ শাসকদল নিজেদের তাগিদে অযোগ্য শিক্ষকদের কোনোভাবেই পৃথক করার সদিচ্ছা দেখায়নি। কারণ তারা অযোগ্য শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে তিন বছর জেল খাটছেন। তদানীন্তন শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলের ভাত খাচ্ছেন। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ও তার বান্ধবীর ঘর থেকে তদন্তকারী সংস্থাগুলি কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করেছে। এছাড়াও এইসব নেতা-মন্ত্রী ও আধিকারিকরা বিভিন্ন স্থানে দুর্নীতির অর্থে সম্পত্তি ক্রয় করে নিজেদের বেআইনি সম্পদ বাড়িয়েছেন। দলীয় নেতা-নেত্রীরা শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করে

দলীয় ও ব্যক্তিগত তহবিল বাড়িয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বাজিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ তারা অন্ধকার করেছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির দ্বারা সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতিতে প্রথমস্থান অধিকার করেছে।

গত এপ্রিল মাসে শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে বলেছিলেন, এই রায় তিনি মানেন না এবং সরকার রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দাখিল করবে। কারও চাকরি যাবে না বলে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন। এমনকী চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি প্ল্যান এবিসি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছিলেন। কেবলমাত্র শাসকদলের আর্থিক দুর্নীতির কারণে মেধাবী যোগ্য শিক্ষকরা আজ পথে বসেছেন। তাদের পরিবার পরিজন আজ অসহায়ভাবে দিনযাপন করছেন। শাসকদলের বেআইনি কর্মকাণ্ডে সমাজের চোখে শিক্ষকদের ভাবমূর্তি ধূলিসাৎ হয়েছে এবং তাদের কীর্তিকলাপ শিক্ষককুলকে সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এহেন অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে তাদের সংসার জীবনে হতাশা নেমে এসেছে। কেউ কেউ ইতিমধ্যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। তার মধ্যে মেদিনীপুরের ডেবরার তপশিলি উপজাতির এক শিক্ষকও রয়েছেন।

এছাড়া শিক্ষকের অভাবে রাজ্যের স্কুলগুলিও ধুঁকছে। বহু শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ না করে স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। রাজ্যের ৮২০০ স্কুল ছাত্রের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। আজকাল সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার গুণগত মান নিম্নমানের হওয়ার জন্য বেশিরভাগ অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রাইভেট স্কুলে পড়াতে বাধ্য হয়েছেন। গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা টাকার অভাবে উপায় না দেখে সরকারি স্কুলে পড়তে বাধ্য হয়েছে। রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে সরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

রাজ্যের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অলিখিতভাবে শাসকদলের ছাত্র ইউনিয়ন ও পরিচালন সমিতির মাধ্যমে দলীয় ক্ষমতা কায়েম করা হয়েছে। বিরোধী পরিসর না থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথেচ্ছাচার চলেছে। শাসকদলের ছত্রছায়ায় কসবা আইন কলেজে গণধর্ষণের ঘটনা ও আরজি কর মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়ার সম্ভ্রমহানি শেষে নৃশংস হত্যা, সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার হারিয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃঢ়চেতা উপাচার্য শান্তা দে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ২৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষা স্থগিত করতে না চাওয়ায়, তাকে প্রত্যক্ষভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তিনি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দলীয় সমাবেশের জন্য পরীক্ষা পিছাতে যথার্থভাবেই রাজি হননি। কিন্তু তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করার প্রচেষ্টা চলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অর্থাৎ শাসককুল শিক্ষাকে শিকেয় তুলে দিয়ে শিক্ষাকর্তাদের দলদাস হিসেবে কাজ করার অপসংস্কৃতি চালু করেছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে পার্টির আখড়া বানিয়ে শিক্ষার সর্বনাশ করেছে।

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবনগুলির কঙ্কালসার চিত্রও ফুটে উঠেছে। কোথাও কোথাও বিদ্যালয়ের ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে এবং এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারছে না। কোথাও আবার বিদ্যালয়গুলির ভগ্ন দশা। কোথাও সিলিং থেকে চাঙ্গড় খসে ছাত্ররা আহত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল বিল্ডিং না থাকায় গাছতলায় ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এগুলির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না দিয়ে মেলা, খেলা ও উৎসবে টাকা বিলিয়ে রাজ্যের কোষাগার শূন্য করে চলেছেন। এটাই প্রমাণ করে যে শিক্ষাক্ষেত্রের সংস্কার ও শিক্ষার প্রসার মুখ্যমন্ত্রীর অগ্রাধিকারের পর্যায়ে পড়ে না। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের মুসলমান তোষণের ফলে নতুন ওবিসি সংরক্ষণের অজুহাতে রাজ্যের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি বন্ধ রাখা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং রাজ্যের শাসকদল রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ছাত্র-ছাত্রীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সারা দেশে অন্যান্য রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হয়ে ক্লাস শুরু করে দিয়েছে। সেদিক থেকে আমাদের ছাত্ররা শুরুতেই পিছিয়ে পড়ল। এই রাজ্যে ভর্তি পিছিয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষকরা সিলেবাস শেষ করার সময় পাবেন না। সময়মতো পরীক্ষা নিতে পারবেন না। শিক্ষাবিদরা বলছেন, বিগদ ২৫ বছরে রাজ্যের ভর্তি নিয়ে এই ধরনের অচলাবস্থা কখনো দেখা যায়নি।

উল্লেখযোগ্যভাবে এবার রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কলেজ পোর্টালে ডিগ্রি কোর্সের জন্য ৯ লক্ষ ৫০ হাজার আসন থাকলেও মাত্র ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার জন ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে অস্বাভাবিক বিলম্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল দেখে বেশিরভাগ পড়ুয়া ইতিমধ্যে প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে সরকারি কলেজগুলির আর্থিক অবস্থা খারাপের দিকে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ উঠেছে, এই ভাবে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা বানচাল করে ঘুরপথে বেরসকারি কলেজগুলিকে কয়েক হাজার কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয় এ বছর গত ২৭ এপ্রিল। অস্বাভাবিক দেরি করে তার ফল প্রকাশ হয় গত ২২ আগস্ট। তারপর তাদের কাউন্সেলিং বাকি রয়েছে। কেবলমাত্র শাসকের রাজনীতির কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে, পড়ুয়াদের পড়াশোনা বিলম্বিত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

ইতিমধ্যে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরও মেডিক্যাল ও ডেন্টালের কাউন্সেলিং হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শেষ না হলে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। এর ফলে ১১ হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী কাউন্সেলিঙের অভাবে মেডিক্যাল পড়াশোনায় অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে সারা দেশে নিট পরীক্ষা দেওয়া ডাক্তারি ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী ৭ সেপ্টেম্বর

থেকে ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং শাসকের ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে পড়াশোনায় পিছিয়ে যাবে এবং সঙ্গে অভিভাবকদের সুশ্চিন্তা বাড়বে। যারা বাঙ্গালিকে বঞ্চনার অভিযোগ করে থাকে, তারাই আজ ন্যায্য অধিকার থেকে বাঙ্গালি ছাত্র-ছাত্রীদের বঞ্চনা করছে।

প্রকৃতপক্ষে শাসকদল মুসলমানদের ৯৮ শতাংশ মানুষকে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার স্বার্থে সমস্ত ক্ষেত্রে অ্যাডমিশন বন্ধ রেখেছে। কারণ ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে মুসলমানদের ভোট চাই। তাই ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারণে ১৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের বাহানায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা চলছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা হাইকোর্টের সর্বশেষ নির্দেশ মতো ২০১০ সালের আগের ওবিসি সংরক্ষণের নিয়ম অনুসারে ভর্তি করার সুযোগ থাকলেও রাজ্য সরকার তাকে মান্যতা দিয়ে ভর্তি করতে রাজি নয়। সেজন্য বিষয়টি দীর্ঘায়িত করে নতুন ওবিসি সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার অভিপ্রায়ে রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে। ২০১০ সালের আগে রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণের হার ছিল ৭ শতাংশ। ২০১০-এ রাজ্য সরকার এটি বৃদ্ধি করে ১৭ শতাংশ করেছে। রাজ্য সরকার 'এ' ও 'বি' ক্যাটেগরিতে ওবিসি তালিকাকে বিভক্ত করেছে। এই তালিকায় 'এ' ক্যাটাগরিতে ৭৯টি মুসলমান সম্প্রদায় ও 'বি' ক্যাটাগরিতে ৬১টি হিন্দু ওবিসি রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত ৩৭টি নতুন সম্প্রদায়কে ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে এসেছেন। এর মধ্যে নতুন তালিকায় ৩৫টি মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং মাত্র ২টি হিন্দুদের থেকে ওবিসিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই ভাবে ঘুরপথে বেশি পরিমাণে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের ওবিসি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। যদিও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ সরাসরি সংবিধানের পরিপন্থী। রাজ্য সরকার আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে 'অনগ্রসর' হিসেবে দেখিয়ে মুসলমানদের ওবিসি সংরক্ষণ দিয়েছেন।

যদিও কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশমতো ভর্তির ক্ষেত্রে পুরানো ৭ শতাংশ ওবিসি কোটায় ভর্তি করা যেত। কিন্তু রাজ্য সরকার নতুনভাবে ১৭ শতাংশ ওবিসি কোটায় ভর্তির জন্য রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। কিন্তু এই অজুহাতে ভর্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ ছাড়া কিছু নয়। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রাজ্য সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে কুঠারাঘাত করেছেন। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে না পেরে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যাদের সামর্থ্য আছে, তারা ইতিমধ্যে অনেকে পুনে, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ ও চেন্নাইয়ে ভর্তি হয়ে গেছে। অন্যান্য রাজ্যে ভর্তি হয়ে ইতিমধ্যে পঠনপাঠন শুরু হয়ে গেছে কিন্তু এক্ষেত্রে 'এগিয়ে বাংলা' কার্যত পিছিয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, আর্থিক ভাবে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীরা অসহায়ভাবে রাজ্যের কলেজে ভর্তির জন্য দিন গুনছে। এই বিষয়ে অবিলম্বে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত অভিভাবক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীরা সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদে শামিল না হলে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষায় আরও পিছিয়ে পড়বে। □

এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের মাথাব্যথার কারণ আছে

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

অবৈধ ভোটারদের নাম মুছে ফেলার জন্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত তৃণমূল কংগ্রেসকে মোক্ষম জায়গায় ঘা দিতে পারে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আগে দলের অনুগত পরিযায়ী ও সংখ্যালঘু ভোটার ভিতকে গুরুতরভাবে জখম করতে পারে এই নির্বাচনী ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে বিহারে সদ্য সমাপ্ত বিশেষ নিবিড় সংশোধন (যদিও আবেদন পর্ব এখনো চলছে বিহারে) পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের অন্যত্র প্রসারিত হবে। এই ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া তৃণমূলের পক্ষে বিপর্যয়কর হতে পারে, কারণ এর ফলে তাদের লক্ষ লক্ষ অবৈধ ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে তালিকা থেকে। কমিশন ঘোষণা করেছে যে দেশব্যাপী নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনে সেই সব ভোটারাদের নাম বাদ যাবে যারা 'সাধারণভাবে সেই এলাকার বাসিন্দা' নন কিন্তু তাদের আরও অন্যস্থানের তালিকায় নাম আছে। এর মানে যে ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজস্থানে কাজ করতে চলে গেছে, সেখানে থাকে এবং সেখানেই দীর্ঘকাল কর্মরত সে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার থাকার যোগ্য নয়। রাজ্যের তালিকা থেকে নাম কেটে তার নাম সেই রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, 'সংশোধিত তালিকায় সেই ভোটারদের নাম বাদ দেবে যারা অন্যত্র চলে গেছে কিন্তু সেখানে নাম লেখাতে অনিচ্ছুক যাতে তারা তাদের আদি রাজ্যে ও স্থানে তাদের ভোটদান করার অধিকার ধরে রাখতে পারে।' যেমন যে ব্যক্তি সাধারণত দিল্লিতে থাকে কিন্তু পাটনায় তার একটা বাড়ি আছে তাকে দিল্লির ভোটার হিসেবে নাম লেখাতে হবে। এইটা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২০ নম্বর ধারায় করা হবে। এই ধারায় 'সাধারণভাবে বাসিন্দা' এই শব্দবন্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যারা 'সাধারণভাবে বাসিন্দা নয় তারা সেই রাজ্যে ভোটার থাকতে পারবে না। কোনো জায়গায় সম্পত্তি থাকা মানেই সেই জায়গার সাধারণ বাসিন্দা নন। পশ্চিমবঙ্গে এর অর্থ কী? এর মানে পশ্চিমবঙ্গের যে সব লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক দেশের অন্যান্য রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছে, যারা সেখানে থাকে ও কাজ করে, তাদের নাম এরাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যান অনুযায়ী এরাজ্য থেকে প্রায় ২১.৬৭ লক্ষ লোক অন্যান্য রাজ্যে থাকে ও কাজ করে। তারা হয় ব্লুকলার কর্মী বা নির্মাণ ও কৃষিকার্যে নিযুক্ত। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহির্গমন করা হোয়াইট কলারের কর্মী ও পেশাজীবীরা অন্তর্ভুক্ত নন, যারা দেশের অন্যান্য রাজ্যে বা বিদেশে কর্মরত ও সেখানে থাকে। কারণ তারা কেউই আর পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে ভোট দিতে চায় না। চেষ্টাই করে না। তবে অর্থনীতিবিদরা বলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহির্গমনকারী দক্ষ ও অদক্ষকর্মীর প্রকৃত সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। ভারতের শ্রম কমিশনার, রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনারের মতো আরও নানা উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নানা সংখ্যা জোগাড় করে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গত পাঁচ দশকে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যান্য রাজ্যে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের জন্য গেছে তাদের সংখ্যা তিন কোটির বেশি হবে। যারা এই তথ্য দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন কলকাতার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যানবিদ অরিন্দম বসু।

তিনি বলেছেন, 'বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিক ওই সব রাজ্যে নাম লেখায় না। কারণ তারা নির্বাচন অফিস কোথায় আছে, কীভাবে নাম লেখাতে হয়তো জানে না বা তারা দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গে ফেরেনি অথবা তারা আদৌ ভাবিত নয়। কারণ এতে তাদের কোনো অর্থকরী লাভ নেই বা অন্য কোনো

বস্তুগত লাভ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজের পরিসংখ্যান অনুসারে বাইরে যাওয়া শ্রমিকদের বেশিরভাগ আধাদক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক, তারা মুর্শিদাবাদে থেকে গেছে। এর পরেই আছে মালদা, নদীয়া, বীরভূম এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা।

এই পরিযায়ীদের জনতাত্ত্বিক ভাগটা জানা নেই, তাই অনুমানে বলা যায় যে এদের অধিকাংশই মুসলমান। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের বেশিরভাগই অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান। আমস্টার্ডামের আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার আধিকারিক সঞ্জীব গুপ্ত বলেছেন, 'আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের ৭৫-৮০ শতাংশ মুসলমান। আর তাদের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। যারা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে জালিয়াতি ও প্রতারণা করে তাদের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য দলিল ও প্রমাণপত্র জোগাড় করেছে। অন্য রাজ্যে পাড়ি জমিয়ে তারা গেছে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতে।' শ্রীগুপ্ত গত কয়েক দশক ধরে অভিবাসন নিয়ে কাজ করছেন বিশেষত অবৈধ অভিবাসন নিয়ে। আর এই সংস্থা অভিবাসন নিয়ে গবেষণারত সমাজতত্ত্ববিদদের একটা বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক। শ্রীগুপ্তের মতামতকে মান্যতা দিয়েছেন মুম্বাইতে অবস্থিত জনসংখ্যা বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীন অভিবাসন ও শহর অধ্যয়ন দপ্তরের শিক্ষক এম শ্রীনিবাস রাও। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

শ্রীরাও বলেছেন, 'বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গে কোনো জমি বা অন্য সম্পদ নেই এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে কাজ নেই তাই তাদের জীবিকার সন্ধানের জন্য রাজ্যে চলে যেতে হয়। কাজেই এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়া কর্মীদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। বাঙ্গালি মুসলমান যারা বঙ্গের মূলনিবাসী তারাও কাজের জন্য অন্য রাজ্যে অভিগমন করে কিন্তু যে সব অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী অন্য রাজ্যে কাজ করে তাদের সংখ্যার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মূলনিবাসী বাঙ্গালি মুসলমানদের সংখ্যাটা অত্যন্ত কম, এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

ওড়িশার বালাসোরের ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যা দপ্তরের দেবেশ মহান্তি বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসীদের অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, 'তারা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অবৈধভাবে অতিক্রম করে, অল্প দিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে বাস করে শুধু ভারতের নাগরিকত্ব প্রমানের তথাকথিত প্রমাণরূপে জাল ও প্রতারণামূলক দলিলের ভিত্তিতে সুসংগঠিত র‍্যাকেটের মাধ্যমে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ড জোগাড় করে। কয়েক মাসের মধ্যেই বা তার চেয়েও কম সময়ে এইগুলো সংগ্রহ করে তারা এবং তারপরে কাজের জন্য অন্যান্য রাজ্যে যায়। কারণ পশ্চিমবঙ্গে কোনো কাজ তারা পায় না।'

এটা তৃণমূল কংগ্রেসকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে? পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা এইসব পরিযায়ী শ্রকিদের একটা বিপুল অংশ তৃণমূলের অনুগত ভোটার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অভীক সেন বলেছেন, 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করে, কারণ শাসক দল তাদের তোষণ করে। তারা জানে যে যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আছে ততদিন তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান খুবই সংবেদনশীল এবং তৃণমূল ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। পূর্বতন সিপিআইএমের মতো প্রতিটা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস এক বিরাট কর্মতৎপরতা চালায়। সেটা স্থানীয় পর্ষদ হোক (পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটি), রাজ্য বিধানসভা বা লোকসভা হোক। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের পশ্চিমবঙ্গের যে জায়গায় ভোটার তাদের সেইখানে ফিরিয়ে আনে, যাতে তারা দলের জন্য ভোট দিতে পারে। তিনি বলেছেন, 'ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়, বাস বুক করা হয় এবং আসা-যাওয়ার জন্য হাত খরচ পাঠানো হয়। এই পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে তারা যেখানকার ভোটার সেইখানে ফিরে আসতে পারে। একবার পৌঁছলে তাদের একটা ভালো রকমের টাকা দেওয়া হয়। এই শ্রমিকদের অনেকেই বিশেষত বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান, যারা ঘরে ফেরে তারা শাসক দলের গুন্ডাবাহিনীতে পরিণত হয়। এরা অন্য দলের সমর্থকদের শাসায়, ভয় দেখায় ও আক্রমণ করে।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক দেবেন হালদার বলেন, '২০১১ সালের আগে এইসব শ্রমিকরা সিপিআইএমের কাছে কৃতজ্ঞ থাকত আর এখন তারা তৃণমূলের কাজে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। এর নানা কারণ আছে। বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা শাসকদলের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে যাতে তারা ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণ জোগাড় করতে পারে এবং অন্য রাজ্যে তাদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়। কর্মস্থল ও আবাসস্থল থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্পন্সর করা সফর, তার সঙ্গে শাসকদলের তরফে দেওয়া হাতখরচের টাকা তাদের তৃণমূল কংগ্রেসের অনুগত ভোটার ও ভয়ংকর মেঠো বাহিনীতে পরিণত করে।' কাজেই তৃণমূল সর্বতো প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই 'সার' বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন আটকাতে। সব বিরোধী গোষ্ঠী এদের সমর্থন দিচ্ছে। দেশে অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করতে এদের চেষ্টার কোনো খামতি নেই। □

শোক সংবাদ

মালদা নগরের অরবিন্দ পার্ক নিবাসী এবং সুভাষ প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক গৌররঞ্জন সরকার (বাসুদা) গত ২০ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছন। উল্লেখ, তিনি মালদহের কলিগ্রামে বাল্যকালেই স্বয়ংসেবক হন। তাঁর ২ পুত্রও স্বয়ংসেবক।

ভারতের সংবিধানে সংস্কার : অমিত শা'র আনা ১৩০তম সংশোধনী বিল

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে একটি সমস্যা জাতির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে--- রাজনীতিতে অপরাধ ও দুর্নীতি। জনগণের আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থতার অন্যতম কারণ এই দুর্নীতি। ২০২৫ সালের ২০ আগস্ট, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংসদে ১৩০তম সংশোধনী বিল উপস্থাপন করেছেন, যার লক্ষ্য দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই পদক্ষেপকে দেশের রাজনৈতিক সংস্কার ইতিহাসে এক মাইলফলক বলা যায়।

১৩০তম সংশোধনী বিলের মূল প্রস্তাব :

- প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনো মন্ত্রী যদি পাঁচ বছর বা তার বেশি শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে ৩০ দিন ধরে জেলে থাকেন, তবে তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পদ হারাবেন।
- এই বিধান যুক্ত হবে—
- ধারা ৭৫ (কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা)
- ধারা ১৬৪ (রাজ্যের মন্ত্রীসভা)
- ধারা ২৩৯এএ (দিল্লি সরকারের বিধানসভা)
- মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় পদাসীন হওয়ার সুযোগ থাকবে।

বিলের পক্ষে প্রধান যুক্তি :

১. দুর্নীতিগ্রস্তদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা :

অতীতে দেখা গেছে, জেলে থেকেও অনেক নেতা সরকার চালিয়েছেন। এতে তদন্ত বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সাক্ষীরা প্রভাবিত হয়েছেন। নতুন আইন দুর্নীতিবাজদের ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে দেবে।

২. অপরাধ করে মন্ত্রী থাকার সংস্কৃতির অবসান : ভারতের গণতন্ত্রে বারবার 'জেল থেকে রাজনীতি'র দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। এই সংস্কৃতি গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। বিল কার্যকর হলে অপরাধ ও রাজনীতি একসঙ্গে চলতে পারবে না।

৩. জনআস্থা পুনরুদ্ধার :

সাধারণ মানুষ মনে করেন, নেতাদের জন্য আলাদা আইন আছে। বিল কার্যকর হলে বোঝা যাবে— আইনের চোখে সবাই সমান। গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়াবে।

৪. ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ :

জেলে থেকেও মন্ত্রিত্ব করলে তদন্তকারী সংস্থা প্রভাবিত হয়। প্রমাণ লোপাট বা সাক্ষীকে ভয় দেখানোর সুযোগ থাকে। দুর্নীতিগ্রস্তরা পদ হারালে তদন্ত নিরপেক্ষভাবে চলতে পারবে।

৫. শুদ্ধ রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা :

দুর্নীতিবাজরা ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে বাদ পড়বেন। রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য হবে সৎ প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে। একটি স্বচ্ছ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

৬. নৈতিকতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা :

নেতারা বুঝবেন— অপরাধে জড়ালে চেয়ার থাকবে না। এতে তাঁরা আরও দায়িত্বশীল ও সতর্ক হবেন। সমাজে ইতিবাচক বার্তা ছড়াবে।

৭. প্রশাসনের স্থিতিশীলতা :

মুখ্যমন্ত্রী/মন্ত্রী জেলে থাকলে প্রশাসন অচল হয়ে পড়ে। পদচ্যুতি হলে নতুন নেতৃত্ব আসবে, সরকার চলবে নির্বিঘ্নে।

৮. আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি বৃদ্ধি :

দুর্নীতি দমনে শক্ত অবস্থান ভারতের ভাবমূর্তি বাড়াবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে। ভারত হবে একটি স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল গণতন্ত্রের মডেল।

সমালোচনার জবাব :

বিরোধীদের দাবি : বিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার হতে পারে।

উত্তর :

এটি শাস্তি নয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আদালতের নির্দেশ ছাড়া ৩০ দিনের বেশি আটক সম্ভব নয়। মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় নির্বাচিত হতে কোনো বাধা নেই। অতএব, এটি বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দমন নয়, বরং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ।

অমিত শা-র আনা সংবিধান (১৩০তম সংশোধনী) বিল ভারতীয় রাজনীতির জন্য এক নতুন দিশা। এতে দুর্নীতিবাজরা ক্ষমতা থেকে দূরে থাকবে। রাজনীতিতে আসবে স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা। গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়বে। প্রশাসন হবে কার্যকরী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত গণতান্ত্রিক সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

এই বিল কার্যকর হলে ভারত সত্যিকার অর্থেই 'দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি'র পথে অগ্রসর হবে। এটি নিছক আইন নয়, বরং গণতন্ত্রের শুদ্ধতা রক্ষার লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক সংস্কার। □

বছর পূর্তি : কেমন আছে শেখ হাসিনা-বিহীন বাংলাদেশ?

শেখ হাসিনা নেই এক বছর। কেমন আছে বাংলাদেশ? একবাক্যে সবাই বলবে, ভালো না। ব্যতিক্রম আছে, জামাত-এনসিপি বলবে, ভালোই তো। বিএনপি আমতা আমতা করবে, কারণ চোখ তার নির্বাচনের দিকে, যেনতেন উপায়ে ক্ষমতায় যেতে হবে! যাবে কি? বলা শক্ত। আওয়ামি লিগ দেশে নাই। নির্বাচন হলে বিএনপি ক্ষমতায় যাবে, নির্বাচন কি হবে? হলেই-বা কেমন হবে সেই নির্বাচন। নির্বাচন কি ড. ইউনুসের নেতৃত্বে হবে, নাকি অন্য কারও নেতৃত্বে? নির্বাচন করার জন্যে জাতীয় সরকার হবে কি? আসুন, আমরা এক বছর আগের বাংলাদেশটা দেখার চেষ্টা করি।

আওয়ামি লিগ সরকারের পতন এবং ইউনুসের উত্থান মানুষকে একরাশ 'অলীক' স্বপ্ন দেখিয়েছিল। বেশকিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছিল। এক বছরের মাথায় স্বপ্ন টুটে গেছে, কঠোর ও নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মানুষ দিশেহারা। প্রথমে বলা হয়েছিল, ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। ড. ইউনুস নিজেই বলেছেন, একটি 'মেটিক্যুলাস' পরিকল্পনার মাধ্যমে শেখ হাসিনার পতন ঘটানো হয়েছে। পরিকল্পনায় জড়িত ছিল জামাত, আমেরিকার ডিপস্টেট, আইএসআই, কাতার, তুরস্ক ও চীন। বর্তমান ইউনুস সরকার চালাচ্ছে জামাত। মনে আছে নিশ্চয়, সেনাপ্রধান ৫ আগস্ট শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের পর প্রথমে জামাতের আমীরকে ডেকেছেন, সেটি কোনো ভুল ছিল না?

গ্লোবাল বেঙ্গলি হিন্দু কোয়ালিশন ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্ভবত প্রথম বলেছিল, ইউনুস সরকার অবৈধ। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে, কীভাবে অবৈধ? তাদের উত্তর ছিল, এই সরকার যে সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে শপথ নিয়েছে সেই সংবিধানে 'অন্তর্বর্তী সরকার'-এর কোনো বিধান নেই, তাই এই সরকার অবৈধ। বাংলাদেশ হাইকোর্ট ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪-এ 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেও অন্তর্বর্তী সরকার বৈধ হয়ে যায় না। দেশের আদালত অবশ্য এর খেসারত দিয়েছে। মব ভায়োলেন্স একসঙ্গে ১২ জন বিচারককে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সবই নিয়তি, যে দেশের প্রধান বিচারপতিকে মেরে ধরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, সেদেশে 'অপমানে হতে হবে সবার সমান' তাই না?

এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। কারণ এই সরকার নিরপেক্ষ নয়, অথচ নির্বাচনটি হওয়া উচিত একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে। ড. ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার নির্দলীয় নয়। হিজবুর তাহরির, ইসলামি আন্দোলন এই সরকারের অংশীদার। জামাত এই সরকার পরিচালনা করছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে গঠিত এনসিপি বা কিংস পার্টি সরকারের দল।

স্পষ্টত দেশের মানুষ এই সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেছে। সরকার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। দেশে জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সরকারের একজন উপদেষ্টা বাংলাদেশে শরীয়াভিত্তিক ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করে একটি টুইট করেছিলেন, তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের কথাও বলেছিলেন, পরে সেটি তিনি ডিলিট করে দেন। এই সরকার দেশের সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে। সরকারের উপদেষ্টা স্বীকার করেছেন, দেশে আইন-শৃঙ্খলা-প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। দেশে বিচার নেই, মিডিয়া নেই। পুলিশ থেকেও নেই, প্রশাসন নেই, সরকার 'মব ভায়োলেন্সের' মাধ্যমে এর মতলব হাসিল করছে এবং মব-ভায়োলেন্সকে বৈধতা দিচ্ছে। প্রতিটি মব-ভায়োলেন্সের পেছনে কোনো না কোনো উপদেষ্টার ইন্ধন রয়েছে। এর দায়িত্ব ড. মহম্মদ ইউনুসকে নিতে হবে বইকি।

নির্বাচন প্রশ্নে বিষয়টি স্পষ্ট যে, দেশের মানুষ একটি অবাধ সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায়, তবে সেটি হতে হবে একটি নির্দলীয়-নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নয়। শেখ হাসিনা বিহীন বাংলাদেশ এক বছরে গহীন অন্ধকারে পতিত হয়েছে। চারদিকে শুধু অনিয়ম, হত্যা, ধর্ষণ আর চাঁদাবাজি। চাঁদার জন্যে পাথর মেরে হত্যা করেছে, দিনেদুপুরে চাপাতি দিয়ে সাংবাদিক হত্যা করেছে। ড. ইউনুস নিজেই বলেছেন, দেশ যুদ্ধাবস্থায়। তিনি কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? তিনি বাংলাদেশকে 'সিরিয়া' বানাতে চান। তিনি থাকলে বাংলাদেশ 'গাজা'য় পরিণত হবে। তিনি নাকি সেন্টমার্টিন, লালমণিরহাট দিয়ে দিয়েছেন। চট্টগ্রাম বন্দর, 'মানবিক করিডোর' দিতে চান। দেশটা ইউনুসের বাপের!

মানুষ শুনেছে শেখ হাসিনা ভারতের সঙ্গে গোলামির চুক্তি করেছেন। গত এক বছরে তাঁরা সেরকম একটি চুক্তিও হাজির করতে পারেননি। অথচ তিনি 'গোপন' বাণিজ্য চুক্তি করেছেন। তলে তলে তিনি দেশ কতটা বেচে দিয়েছেন, সেটি টের পাওয়া যাবে তিনি বিদায় হলে। শেখ হাসিনার আমলে নাকি ২৬ হাজার ভারতীয় চাকুরি করতো, এখন পর্যন্ত একজনও খুঁজে পাওয়া যায়নি? শেখ হাসিনা যদি খারাপ হয়, ইউনুস তাহলে বদমাইশ। শেখ হাসিনা স্বৈরাচার, ইউনুস স্বৈরাচারের বাপ। শেখ হাসিনার আমলে ১৬ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলার লোপাট হয়েছে, ড. ইউনুসের এক বছরে ২০ বিলিয়ন খোয়া গেছে। পঁচাত্তরের পর বাংলাদেশে সকল সরকার রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করেছে। শেখ হাসিনা করেছেন, তিনি মরেছেন। ড. ইউনুস করছেন, তিনি মরবেন। পার্থক্য হচ্ছে, শেখ হাসিনার ফেরার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ড. ইউনুস গেলে আর ফিরতে পারবেন না। হয়তো ড. ইউনুসের নাম মিরজাফরের সঙ্গেই উচ্চারিত হবে।

—**শিতাংশু গুহ,**
নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

ফ ঃ ৩

পঁচাত্তরের প্রাক্কালেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বমহিমায় উজ্জ্বল

অজয় ভট্টাচার্য

সত্তরের কাছাকাছি বয়সে পৌঁছেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন 'শেষের কবিতা'র মতো কালজয়ী উপন্যাস। পাবলো পিকাসো এঁকেছিলেন দুনিয়া কাঁপানো ছবি 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'। অমিতাভ বচ্চনের অভিনয় দক্ষতায় তৈরি হয়েছিল ঋতুপর্ণ ঘোষের 'দ্য লাস্ট লিয়ার'-এর মতো অনবদ্য ছবি। কাবুলিওয়ালা চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে সত্তরোর্ধ্ব মিঠুন চক্রবর্তী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বয়স একটি সংখ্যামাত্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বর্তমান বয়স ৭৪ বছর এগারো মাস কয়েকদিন। এই বয়সেও তিনি বিরামহীন। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে ছুটে চলেছেন অনবরত। জুলাই মাসের ২ থেকে ৯ পর্যন্ত ঘানা, ট্রিনিদাদ, টোবাগো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও নামিবিয়া সফর করলেন। তারপর সেই জুলাই মাসেই ২৩ থেকে ২৬ পর্যন্ত করে এলেন যুক্তরাজ্য ও মালদ্বীপ সফর। প্রসঙ্গত মোদী বিশ্বের অন্যতম বেশি ভ্রমণ করা রাষ্ট্রনেতাদের একজন, যার ফলে ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। লালকেল্লা থেকে টানা ১২টি ভাষণ দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর রেকর্ড ভেঙেছেন। আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে দীর্ঘতম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দেওয়ার রেকর্ড তাঁরই। তাঁর সময়ে একদিকে ভারত মহাকাশ গবেষণায় ঐতিহাসিক সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে, আর অন্যদিকে বিশ্ব যোগ দিবস (২১ জুন) নিয়ে জাতিসঙ্ঘে ভারতের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে বিজেপি স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতায় আছে ১৫টিতে। এনডিএ সঙ্গী নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আছে মোট ২১টি রাজ্যে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি একাই বিজেপি দলকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দিয়েছিলেন, যা প্রায় ৩০ বছর পরে কোনো দল সেই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তাঁর ক্যারিশ্মাতেই বিজেপি আরও বড়ো ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছিল। ভারতের দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে তিনি একজন। জওহরলাল নেহরুর পরে তিনিই টানা তিনটি সাধারণ নির্বাচনে দলকে জয়ী করে নিজের নেতৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিয়ে হিসেব করলে তিনি ২০০১ থেকে টানা এখনো ক্ষমতায় আছেন। অর্থাৎ মোট ২৪ বছর ক্ষমতায় আছেন। যা সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে বিরল। ২০০১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১২ বছর ৭ মাস ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ২০১৪ থেকে এখনো পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী। গুজরাটের ইতিহাসে তিনিই ছিলেন দীর্ঘতম সময়ের মুখ্যমন্ত্রী। আর এতসবের জন্যই তাঁর সমালোচকদের ঘুম উড়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। তাঁরা অপেক্ষায় আছেন কবে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ আসবে। আর মোদী পঁচাত্তর বছর পূর্ণ করবেন। তাহলেই পঁচাত্তরের গেরোয় পড়ে মোদীকে অবসর নিতে হবে। তাঁরা স্মরণে রেখেছেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের একটি উক্তি—'৭৫ বছর বয়স হলে থামতে হয়'। অবশ্য এটা তিনি কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেননি। রাজনৈতিক লড়াইয়ে মোদীর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে তাঁরা এই উক্তির নিশানা প্রধানমন্ত্রীকেই মনে করেছেন। তাঁরা অপেক্ষায় আছেন তাঁর অবসর ক্ষণের। কিন্তু তাঁদের অপেক্ষাতে থাকতে হবে আরও কিছুকাল। কারণ এক্ষেত্রে দেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেশি পছন্দ করছেন।

এই বয়সেও মোদী কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ রকে টানা ৪৫ ঘণ্টা ধ্যানস্থ হতে পারেন। আবার রাত জেগে সিঁদুর অভিযানের উপর নজরদারি করতেও পারেন। তাঁর নেতৃত্বেই কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই তাঁর ডিসট্যান্ট সেকেন্ডকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। একদা নিজের পরিবার নিয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সমগ্র দেশবাসী আমার পরিবার। দেশের সমস্ত মা ও বোন আমার পরিবারের অংশ। আমি পরিব্রাজকের বেশে, কপর্দকহীন ভাবে দেশের কোণে কোণে ঘুরেছি। তখন এই মায়েরাই আমার ক্ষুধা নিবৃত্তিতে এগিয়ে এসেছিলেন।' আবার পুলওয়ামা কাণ্ডের পর হুতাত্মা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের সাহসী সন্তানরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের ত্যাগ বৃথা যাবে না!' বলার সময় তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে এসেছিল। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ব্যক্তিগত সংসার ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে পুরো জীবনটা রাজনীতি, সংগঠন আর দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। তাই তিনি যে ইতিহাসের অনেকটা অংশ জুড়ে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন, তা বলাই বাহুল্য। □

শুভ্রা মল্লিক

রান্না ঘর সামলানোর টিপস্

সদ্য বিয়ে হয়েছে অস্মিতার। বিয়ের পর এদিক ওদিক নেমতন্ন, টুকটাক ঘোরাফেরা, হানিমুন সেরে এবার গুছিয়ে বসার পালা। অফিসও শুরু হয়েছে জোরকদমে। স্বামী-স্ত্রীর চাকরির কারণে বাপের বাড়ি-শ্বশুরবাড়ি দুই ছেড়ে আলাদা শহরে সংসার পাততে হয়েছে তাদের। বাড়িতে আলাদা করে অভিভাবক কিংবা বেরনোর সময় হাতের কাছে এটা-ওটা গুছিয়ে দেওয়ার লোক নেই। স্বামী বিশাল বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজের বেরনোর জন্য মেরেকেটে এক ঘণ্টা সময়ও হাতে থাকে না। নতুন জায়গায় বিশ্বস্ত পরিচারিকা পেতেও সময় লাগে। তাই অপটু হাতেই বেশিরভাগ কাজ সামলাতে হচ্ছে অস্মিতাকে।

চাকরির ঘোড়দৌড়, তাড়াহুড়োয় অফিস ও হেঁশেল একসঙ্গে সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়। সকালের জলখাবারের সঙ্গে নিজেদের অফিসের টিফিন, বাড়ির খুদে সদস্যটির জন্য দুপুরের খাবার বা টিফিন বানানো, বয়স্ক সদস্যদের জন্য খাবার তৈরি সবই রোজকার রুটিন। আবার খাবারেও চাই বৈচিত্র্য। তাই আগে থেকে পরিকল্পনা করে না রাখলে সকালে হেঁশেল সামলাতে কালঘাম ছুটবে। সুতরাং সহজ কিছু কৌশল জানা থাকলে, চটজলদি রান্নাও হবে, খেতেও হবে সুস্বাদু।

কোন কোন পদ ভেবে নিন : আগের দিন রাতেই ঠিক করে নিন কার কী কী রান্না হবে। অনেক বাড়িতে সকালে বাজার সেরে রান্নার প্রচলন আছে। তবে অফিস যাওয়ার চাপের মধ্যে এই পদ্ধতি খুব সুখকর হবে না। বাজার করার সময় এক সঙ্গে তিন-চার দিনের বাজার সারুন ও আগের দিন রাতেই পরিকল্পনা করে রাখুন কী রান্না করবেন। খুব দীর্ঘ রেসিপি সকালের জন্য রাখবেন না। রাখলেও তার বেশিরভাগ প্রস্তুতি আগের দিন করে রাখুন। প্রাতরাশে কী বানাবেন, অফিস বা স্কুল-কলেজের টিফিনে কী দেবেন, দুপুরের রান্না কী হবে সব ঠিক করে রাখুন আগেই। এতে ভাবনা ও আয়োজনের জন্য সময়টা বেঁচে যাবে।

দ্রুত ভাত রান্নার টিপস : সকালের তাড়াহুড়োয় অনেকেই ভাতের ফ্যানের আন্দাজ বুঝতে পারেন না। হয় বেশি ফুটিয়ে ফেলেন, নয়তো জল কম দেওয়ায় ভাত সেদ্ধ হতে অনেকটা সময় ব্যয় করেন। ফ্যান গালতে দেরি হবে আবার ভাতে মাড় কিছুটা বসে একে অন্যের গায়ে জড়িয়ে যায়। ভাত রান্নার সময় চাল ও জলের অনুপাত জেনে নিন। চালভেদে এই জলের অনুপাত অনেক সময় বদলে যায়। রান্নার আগে চাল কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। চাল ভিজিয়ে হাতের কাজ সারুন। এবার ভাত রান্নার সময় ভাতের জলে একটা পাতিলেবু চিপে দিয়ে দিন। এতে ভাত ঝরঝরে হবে, ফ্যান গালতে একটু দেরি হলেও একে অন্যের গায়ে জড়াবে না এবং ভাত থেকে লেবুর হালকা সুগন্ধ বেরবে।

রান্নার আগের প্রস্তুতি : পরের দিন কী কী রান্না হবে তার প্রস্তুতি আগের দিন রাতেই করে রাখুন। তরিতরকারি ধুয়ে, কেটে রাখুন এয়ারটাইট ব্যাগে। এভাবেই ফ্রিজে রেখে দিন। তাতে টাটকাও থাকবে, সকালে ব্যবহারও করতে পারবেন। শাক রান্না করার পরিকল্পনা থাকলে আগের রাতেই তা কুচিয়ে নুন-জলে ধুয়ে শুকনো করে একটা বায়ুনিরুদ্ধ ব্যাগে রেখে দিন। আদা-রসুন গোটা গোটা ব্যবহার করলে তাও আলাদা কৌটোয় ভরে রাখুন। যেসব মশলা পরের দিন সকালে লাগবে, তা হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন।

মশলা তৈরি করে রাখুন : সকালে উঠে বাটাবাটি বা গুঁড়ো করার ঝঞ্ঝাটে যাবেন না। তার চেয়ে রাতেই সেরে রাখুন সেই কাজ। আদা-রসুনও বেটে রাখতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে আলাদা এয়ারটাইট পাত্রে বেটে ফ্রিজে রেখে দিন। খোলা পাত্রে রেখে ঢাকা দিয়ে রাখলেও কিন্তু ফ্রিজে গন্ধ হবে। তাছাড়া ফ্রিজের আর্দ্রতার প্রভাব পড়বে মশলায়। এতো গেল প্রস্তুতির সাতকাহন। রান্নার সময়ও যদি একটু সচেতন থাকেন, তাহলেও কিন্তু বাঁচতে পারে সময়। সব দিক সামলে চলা গৃহিণীরা এমন ঘরোয়া উপায়ে আস্থা রাখেন।

ঢাকাচাপা দিয়ে রান্না : খাবার দ্রুত রান্না করব, তেল বেশি দেব না অথচ সুস্বাদু হবে— এই তিন মন্ত্রে বিশ্বাসী হলে সাধারণ তরিতরকারি ঢাকা দিয়ে দিয়ে রান্না করুন।

অনেকে তাড়াহুড়োয় আঁচ বাড়িয়ে ঢাকা ছাড়াই রান্না করতে শুরু করেন, এতে তেমন স্বাদও হয় না, আবার অনেক সবজিই আধসেদ্ধ থেকে যায়। তাই আঁচ মাঝারি রেখে প্রয়োজন মতো ঢাকা দিয়ে রান্না করুন।

জটিল রেসিপি নয় : যে রেসিপিতে খাটনি বেশি, সময় অনেক বেশি লাগে, সেগুলো অফিসের দিন না করে উইকএন্ড বা ছুটির দিনের জন্য তুলে রাখুন। বরং কখনো কুচো চিংড়ি, কখনো পোস্ত কখনো সর্ষে বাটা, কাসুন্দি ইত্যাদি ব্যবহার করে তরকারিকে সহজেই সুস্বাদু করুন। এই ধরনের রান্নায় সময়ও অনেক কম লাগে।

ওভেনের সদ্ব্যবহার : তাড়াহুড়োর সময় বাড়ির দু'-তিনটি গ্যাস ওভেনকেই ব্যবহার করুন। কোনোটায় ভাত বসিয়ে, পাশেরটায় তরকারি রাঁধুন। অনেকের বাড়িতে তিন-চার ওভেনের গ্যাস বার্নার দেখা যায়। পারলে ওই সময় দুধ বা কোনো ভাজাভুজি অন্য দুটোয় বসিয়ে দিন। পালা করে করে মাঝেমাঝেই দেখে নিন সবগুলি। একসঙ্গে অনেক ওভেন সামলাতে না পারলে অন্তত দুটি ওভেনে রান্না সারুন।

নুন ও জলের পরিমাণে নজর : তরকারি বা ঝোল রান্নার সময় অনেক সময় তাড়াহুড়োয় অনেকেই বেশি জল দিয়ে ফেলেন। পরে সেই ঝোল ঘন করতে কিছুটা সময় ব্যয় হয়। জল দেওয়ার সহজ নিয়ম— সবজি ও মাছ যেন ঝোলে সম্পূর্ণ ডুবে না যায়। □

খাবার খাওয়ার মধ্যে ব্যবধান

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

জীবনধারণের জন্য খাবার অপরিহার্য। খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে সুষম ডায়েট আর সঠিক সময় মেনে চলাটা খুবই জরুরি। এই খাবারই আমাদের শরীরের বাড় বা বৃদ্ধি, পুষ্টি, ক্ষয়পূরণ আর রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। দিনে চারটে মিল— ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার আর মাঝে একটা স্ন্যাক্স অবশ্যই খাওয়া দরকার। মোটামুটি চার-পাঁচ ঘণ্টা পর পর খাওয়া উচিত। সেটাই উপযুক্ত গ্যাপ। অনেকে প্রতি ঘণ্টায় অল্প অল্প করে খান। এটা খুব একটা ঠিক নয়, বৈজ্ঞানিক তো নয়ই। এমন করলে ফ্লাকচুয়েশন বেশি হয়। আমাদের দেশে যদিও লাঞ্চটাই ভারী হয়, কিন্তু ব্রেকফাস্ট হওয়া উচিত ভারী থেকে অতি-ভারী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। ডিনার হবে তুলনামূলক হালকা।

যাটের দশকে প্রখ্যাত নিউট্রিশনিস্ট অ্যাডেল ডেভিস পুষ্টির জন্য জনপ্রিয় স্লোগান বানান— 'রাজার মতো প্রাতরাশ খান, দুপুরে রাজপুত্রের মতো আর দরিদ্রের মতো রাতের খাবার খান।'

এবার দেখে নেওয়া যাক, কেমন হতে পারে একটা আদর্শ সময়সূচি :

সকালের খাবার : ব্রেকফাস্ট দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার। কারণ, সকালবেলাতেই আমাদের বিপাকক্রিয়া শুরু হয়, হরমোনের মাত্রাও এই সময় বেশি থাকে। আমরা যদি ঘুম থেকে ওঠার পর খালি পেটেই বেশ খানিকক্ষণ কাটাই, তাহলে আমাদের শরীরে তৈরি হওয়া অ্যাসিড পরিমাণে বাড়বে আর তাতে শরীরের ক্ষতি হবে। যেহেতু রাতের খাবারের পর অনেকটা ব্যবধান থাকে, তাই প্রথম খাবার হিসেবে ব্রেকফাস্ট একটু ভারী আর বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবার খেলেও সমস্যা হয় না। পুরো দিনটা শরীর সময় পায় সেই ক্যালরি খরচ করার। সকালে ভরপেট খাবারে দিনের পরেরদিকে খুব বেশি খিদে পাবে না। ফলে, বার বার খাওয়ার প্রবণতা কমবে।

এছাড়া শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি আর ওজন ঠিকঠাক বজায় রাখতে সকালের খাবার বেশ সাহায্য করে।

দুপুরের খাবার : দুপুর আর সকালের খাবারের জন্য ৪ ঘণ্টার ব্যবধান থাকা উচিত। সাধারণত বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে দুপুরের খাবার খেতে হবে। তবে, প্রত্যেকের জীবনযাত্রার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হবে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চের সময়। তবে ৪ ঘণ্টার ব্যবধান না থাকলে বদহজম কিংবা অম্বলের মতো সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া, খাবার খাওয়ার পর রক্তে শর্করার পরিমাণ কতটা বাড়বে বা কমবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে দুপুরের খাবার সময়ের ওপর। ঠিক সময়ে উপযুক্ত খাবার দুপুরে খেলে শরীরের মেটাবলিক রেট বৃদ্ধি পায়। ফলে, শরীর চনমনে আর সুস্থ থাকে এবং কাজ করার ক্ষমতাও বাড়ে।

রাতের খাবার : সাধারণত রাতে তাড়াতাড়ি খাবার খাওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে এর পেছনে। আমাদের শরীরে 'বায়োলজিক্যাল ক্লক' বলে একটি নিজস্ব ঘড়ি আছে। আমরা কখন ঘুমোচ্ছি, কখন কী খাচ্ছি, কতটা পরিমাণে খাচ্ছি, আমাদের লাইফস্টাইল ইত্যাদি সবকিছুর ওপর নির্ভর করে এই ঘড়ি। সাধারণত আমাদের শরীরে সন্ধ্যে ৭টার পর হজমশক্তি অনেকটা কমে আসে। যদিও এই সময়টা পুরোপুরি বায়োলজিক্যাল ক্লকের ওপর নির্ভরশীল। কারণ, প্রত্যেকের দৈনন্দিন রুটিন আলাদা। আজকাল মানুষ বিভিন্ন পেশায় জড়িত। বহু মানুষের নাইট শিফট থাকে কিংবা কেউ হয়তো অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন। ফলে, সবার পক্ষে সময় মেনে এবং ঘড়ি ধরে ডিনার করা সম্ভব নয়। নাইট শিফটে কাজ করে কেউ হয়তো সকাল আটটায় ঘুমোতে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে সকাল ৮টা কিন্তু তাঁর ডিনার টাইম। এরপর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠবেন, সেটাই হবে তাঁর ব্রেকফাস্ট টাইম। যদি কেউ সকাল ৭টার বদলে ৯টায় ঘুম থেকে ওঠেন, তাঁর বায়োলজিক্যাল ক্লক সেভাবেই অ্যাডজাস্টেড হবে। তবে, এটা ঠিক যে, রাতের খাবার পুরো দিনের মধ্যে সবচেয়ে হালকা হওয়া উচিত। আর একথাও সত্যি— খাবার খেয়েই শুতে যাওয়াও শরীরের পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক।

বিশিষ্ট এক ভারতীয় পুষ্টিবিদ জানালেন, ডিনার যখনই করুন, মনে রাখবেন— খুব ভারী ডিনার করা অবশ্যই উচিত নয়। আর শুতে যাওয়ার অন্তত এক থেকে দেড় ঘণ্টা আগে ডিনার করুন; এতে আপনার শরীর খাবার হজম করার সময় পাবে। □

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ধর্মঘট লক্ষ্যহীন নিমেষে ভরা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

পশ্চিমবঙ্গের দেওয়ালে দেওয়ালে অদৃশ্য কালিতে লেখা হয়েছে— অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষা ধর্মঘট। শিক্ষা যে সিস্টেমে দুর্মূল্য হয়, তার তখন নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। বিচ্ছেদ ঘটে মনুষ্যত্বের উপকরণ থেকে। এই বাঙ্গালির একটা ইতিহাস দেওয়াল জুড়ে লেখা ছিল, তা হলো, 'ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বসিয়াছে গরিবের ছেলেরা বিনা বেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়োছে।' পশ্চিমবঙ্গে একসময় দারিদ্র্য প্রবল হয়, দেশ ভাগের পর অনেক টানাপোড়েন এই বাঙ্গালিদেরই সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার আত্মসম্ভ্রম ছিল। শিক্ষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রণালী বদলেছে। আমাদের মনীষীরা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন কিন্তু এত নীচু পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেননি যেখানে রাজ্য শাসনপ্রণালীর প্রধান উপকরণ একদিন হবে মিথ্যাচার আর দুর্নীতি। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এমন ক্ষমতা ধরেছে যেখানে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, মেধা তালিকা সব বন্দোবস্তে টাকা, ক্ষমতা, পক্ষপাতের পচা গন্ধ। দুর্নীতিতন্ত্রের মধ্যে রাজ্য প্রশাসনের শয়নগৃহ হলে কর্তৃপক্ষ একটুও লজ্জিত নয়। আমাদের লজ্জা, কারণ পশ্চিমবঙ্গ, ওয়েস্ট বেঙ্গল গুগলে টাইপ করলেই আপনা থেকেই দৃশ্যমান হচ্ছে— টিচার রিক্রুটমেন্ট স্ক্যাম। ওবিসি কন্ট্রোভার্সি। দৃশ্যমান হচ্ছে— কলেজে আসন খালি। অটো সাবজেক্ট গুগল মহাশয় দেখাচ্ছে— এমবিবিএস, বিডিএস-এ ভর্তি থমকে। রাজ্যবাসীর রাগদ্বেষের সীমা টপকেছে এই আহ্লাদিত নৈরাজ্যে। রাজনৈতিক ক্ষমতা অনেক সময়ই বিরূপসত্তাকে প্রশ্রয় দেয়।

পৃথিবীর সর্বত্র এ এক সাধারণ ঘটনা। কিন্তু একটা সাংস্কৃতিক ভাবে বিজিত জাতি শিক্ষক নিয়োগ অথবা শিক্ষার ঘরে এইমাত্রার আইনি ত্রুটি, নৈরাজ্য, অনাচার সংঘটিত করবে, যা রাজ্য শিক্ষা ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়ের পথে থামাবে! ভেবেছিল কেউ? মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পরিবর্তনের রুট মার্চ করতে করতে যেদিন ক্ষমতায় এসেছিলেন সেদিন তিনিও কি জানতেন তাঁকে তাঁরই প্রশাসনিক বেচালের জন্য সাংবাদিক সম্মেলনে বলতে হবে— আপাতত মেডিক্যাল ও ডেন্টাল মেডিক্যালে ভর্তি স্থগিত। আসলে স্থগিত পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই। ক্ষোভ, বিরক্তি মুলতুবি রেখে অত্যুক্তিজ্ঞানে কর্তৃপক্ষ বলে দিল— আপাতত মুলতুবি ভর্তি। কিন্তু একটা আলোচনা হলো না ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কী হবে? ছাত্রদের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা পাবে? শিক্ষার হাল, হার, মান, চর্চার আয়োজন ঠিক কী, তা নিয়ে একটা গণতান্ত্রিক সম্মেলন বা লোকসমীক্ষার সাহস আছে মুখ্যমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রীর! পলিটিক্যাল কাঁটাগাছ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষার দুর্ভাগ্য। নতুন শিক্ষার্থী প্রজন্ম যতটা বলহীন হবে, নিঃসত্ত্ব হবে ততটাই কালকের তৃণমূল, যুব তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী, নীতিহীন ক্যাডার পাবে। তাই একটা সাংবাদিক সম্মেলনে ফটাফট বলে দিলেই হলো— আপাতত ভর্তি স্থগিত। রাজ্যের শিক্ষার উন্নতিতো দূর, গতিটাই প্রতিহত। শিক্ষক পরিকাঠামো নির্জীব।

শিক্ষক দুর্নীতি, ২০১৬ স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনিক মদতে অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া— মহামান্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ২৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষক, অশিক্ষকের চাকরি বাতিল। মহামান্য শীর্ষ আদালত বারবার নির্দেশ দিয়েছেন আসল 'অযোগ্য'দের রাজ্য সরকার

নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করুক— তবেই ‘প্রকৃত’ যোগ্যদের বিষয়ে বিবেচনার অবকাশ থাকবে আদালতের। রাজ্য সরকার কিছুতেই তা করল না, সেখানেও স্থগিত মুড়ি মিছরি পৃথক করার কাজ। মুড়িমিছরি পৃথক করে দেখালেই যে প্রশ্ন আসবে, যদি পৃথক করাই গেল, তবে একাকার হলো কীভাবে? কার অনুপ্রেরণায় দলে দলে ‘অযোগ্য’ শিক্ষক, সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি করা শিক্ষক বা বলা উচিত তৃণমূলের দয়ায় ছদ্মবেশী শিক্ষকরা সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করেছিল? কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হবে। তাই যাক যোগ্যদের চাকরি। তবুও নকল শিক্ষকদের চিহ্নিত করল না রাজ্য সরকার। এই যে ২৬ হাজার পদ শূন্য, তার উপর আগে থেকেই প্রতি স্কুলে শিক্ষক ঘাটতি। ঘাটতির উপর আরও ঘাটতিতে একবারও আলোচনা হয়েছে কারা নেবেন ক্লাস? কীভাবে চলবে পঠনপাঠন? আপাত চলমান কর্মরত শিক্ষক পিছু ক্লাস, পড়ানোর সময় ঘণ্টা ঠিক কতক্ষণ, তার একটা শ্বেতপত্র প্রকাশের ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতাসীন শাসকদলের? প্রশ্ন করলেই ফিরিস্তি ছুটবে এত স্কুল বানিয়েছি, টিনের চালার স্কুল আজ দো-তলা। ওই দো-তলাটাই যেন কাল হয়েছে শিক্ষার। শিক্ষক নেই, নকল শিক্ষক, ছাত্র ভর্তির হালটাও তথৈবচ। একটার পর একটা সরকারি বাংলামাধ্যম স্কুলে অর্ধেক ছাত্র আসনও শিক্ষাবর্ষে ভরে না।

শিক্ষা নৈরাজ্য বেঁধে ছেঁদে, নিয়মবিরুদ্ধতাকে স্বাভাবিক রাখার জন্য একটা মুখোশ তো দরকার। তার জন্য রয়েছে ওই নীলসাদা ফাঁকা কক্ষের বাহ্যিক ঝকঝকে স্কুলবাড়িগুলি। সংকটের মুখে কলেজগুলি। যদি বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধীনের কলেজের সংকট দেখি— আতঙ্কিত হতে হবে। মোট ৪৬টি ডিগ্রি কলেজের ৭৪ হাজার ৩৮১টি আসনে ভর্তির জন্য আবেদন জমা হয়েছে ২৪ হাজার। যদি সব আবেদনকারী ভর্তিও হন তাহলেও ফাঁকা আসন থাকতে পারে ৫০ হাজার। আবেদনের সময়সীমা বেড়ে হলো ৬ জুলাই। তারপর ১৫ জুলাই। এযেন লোকাল রুটের বাস। যাত্রী ডেকে ডেকে আসন ভরবে, তারপর চালক খৈনি টিপে গাড়ি ছাড়বে। সোজাকথা; ছেলেপুলে লেখাপড়ায় আগ্রহ হারাচ্ছে। অলিতেগলিতে বলতে শুনছি— এইতো দশা, চাকরি পাওয়ার বদলে হওয়া চাকরি চলে গেল হাজারে হাজারে। কী হবে পড়ে! তবুও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যা, বা আগ্রহ কিন্তু স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ও উচ্চশিক্ষার থেকে মুখ ফেরাচ্ছে, বিশ্বাস হারাচ্ছে অধিকাংশ ছাত্র। এর দায় নেবে না রাজ্য সরকার? শিক্ষা দুর্নীতির জন্যইতো শিক্ষায় এমন অনাস্থা, শিক্ষার এমন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দশা। পড়ুয়াদের মনের দশা ঠিক যেন মধ্যযুগের কবিতাটার মতো—

‘লিখিবো পড়িবো মরিবো দুঃখে,
মৎস্য মারিব খাইবো সুখে।।’

কী হবে পড়ে? গ্রাম মফস্‌সল জেলার সাধারণ বাড়ির শতশত ছাত্র-ছাত্রীর এখন এটাই মনের দশা। উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান শিক্ষা দুর্নীতিই এরজন্য সম্পূর্ণ দায়ী। মমতা ব্যানার্জি কী সুন্দর বলছেন— অনগ্রসর শ্রেণী তালিকা (ওবিসি লিস্ট) জটের জন্য আপাতত মেডিক্যালে, ডেন্টালে ভর্তি বন্ধ। পুরো বিষয়টাই এখন আদালতের কাঠগড়ায়। কী রায় শেষমেশ প্রকাশিত হয় ভারতের মহামান্য শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে তা নিশ্চিত আমাদের দেখার অপেক্ষায় থাকছে। শুনানির পর শুনানি। রাজ্যের শীর্ষ আদালত থেকে তা ভারতের শীর্ষ আদালতে কড়া নাড়ছে। শিক্ষক নিয়োগ মামলা থেকে ওবিসি সার্টিফিকেট প্রতিটি বিষয়েই কেন মহামান্য শীর্ষ আদালতকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে? এটাইতো সবচেয়ে বড়ো নৈতিক অধঃপতনের সূচক। সংকট সেটাই যেটা প্রশাসনিক জোরে কাজ সম্পন্ন হয় না। হয় না, কারণ প্রশাসন নিজেই ভক্ষক। মমতা ব্যানার্জি নিজেও জানেন ২০১২-তে যে নতুন তালিকাভুক্ত ওবিসি গঠন আনেন তা তোষণের স্বার্থবুদ্ধিতেই। যেখানে মুসলমান ভোটব্যাংক মজবুত করার লক্ষ্যেই ওই ওবিসি তালিকার বদল।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন রাজ্যের ওবিসি সংরক্ষণ রিভিউ করেছে বলে মমতা ব্যানার্জি সাফাই দিচ্ছেন এবং আইনত এক্সিকিউটিভ পাওয়ারে রাজ্য সরকার ওবিসি তালিকা নিশ্চয়ই বদল, সংযোজন সংশোধন করলে পারে। সবটা মেনেই বলা, সেই সংযোজন, সংশোধন একপেশে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছিল। সেই সংযোজন, বিবর্তন, পরিবর্তন আদৌ নিরপেক্ষ ছিল না। ওবিসি-এ ক্যাটাগরি যা ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ধরে, তার ৮১টি কমিউনিটির ৫৬টিই মুসলমান। একইভাবে ওবিসি-বি যা ৭ শতাংশ সংরক্ষণ ধরে, তার ৯৯টি কমিউনিটির মধ্যে ৪১টি মুসলমানদের। অর্থাৎ মোট ১৮০টি কমিউনিটির ৯৭টিই মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। এখানে সংরক্ষণেও মুসলমান তোষণের নমুনা দেখা যাচ্ছে, কারণ সকলের নিজের ভোটব্যাংকের প্রতি দায়বদ্ধ। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সমিরুল ইসলাম এই সংযোজনের পর বলেন এমন ঘটনা ‘ঐতিহাসিক’ এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এ এক দৃষ্টান্ত হবে। মহামান্য কলকাতা শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ৭৭টি ক্যাটাগরিকে রাজ্যের দেওয়া ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে গভীর প্রশ্ন এবং জটিলতার উত্থান। মমতা ব্যানার্জি যেন Sachar Commitee Report ২০০৬-কেই শিখণ্ডি করছেন। কোনো ‘Sweet will’ কি আদৌ আছে এই ওবিসি তালিকার? সেই প্রশ্ন থেকেই মহামান্য কলকাতা শীর্ষ আদালত ১২ লক্ষের ওপর ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করেন যা ২০১০ সালের পর থেকে সংযোজিত।

খুব স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকার দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ। কিন্তু ক্ষতিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই ছাত্রদেরই। আদালতে মামলা স্থগিত, ছাত্র ভর্তির ভবিষ্যৎটাও স্থগিত। মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তি, যতক্ষণ না আদালতের নির্দেশে ওবিসি তালিকার জট কাটে ততক্ষণ সবাই ছুটিতে থাক। এমবিবিএস, বিডিএস— প্রথম বর্ষের কাউন্সিলিং স্থগিত অনির্দিষ্টকালের জন্য। একটা ‘জরুরি বিজ্ঞপ্তি’ দিয়ে তো দেওয়াই যায়। কিন্তু তার ব্যাখ্যা, তার ফলাফল, তার প্রভাবটা যে কতটা অনিশ্চিতের দিকে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঠেলে দেয়, তা কিন্তু ভুল করেও চর্চা হয় না। ওবিসি সার্টিফিকেটেও ‘সুবিধা’ দেওয়া হয়েছিল কিছু বিশেষ শ্রেণীকে, তাই আজ অনিশ্চিত অনেক ছাত্রের পঠনপাঠন। শিক্ষা প্রসঙ্গে আইনস্টাইন ১৯২৬ সালে আমস্টারডামে (প্রকাশিত হয় Mein Weltbild Amsterdam : querido verlag 1934) লিখেছেন— Individuals in question are men of the highest reputation, esteemed and respected everywhere, nevertheless the impression remains...

ঠিক সে সময়েই এই প্রান্তে বাঙ্গালিরা বলছেন, ‘প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে— কর্তৃপক্ষ যদি কোনো আশঙ্কা রাখিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, সে আশঙ্কা কীরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দূর করিতে পারি।’ বর্তমান রাজ্য সরকার অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে রাজ্যবাসীকে সব গঠনমূলক কাজের থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দূরে রেখেছে। শিক্ষার সব প্রক্রিয়া স্থগিত রেখেছে। সবকিছু স্থগিত রেখে যখন সরকার চলে তখন তা শাসকতন্ত্র। তা আবার যদি একনায়কতন্ত্র হয় তখন তো স্বেচ্ছাচারিতা।

শিক্ষাব্যবস্থার নিদ্রাবেশ লক্ষ্যহীন নিমেষে ভরা। ■

সারদা শিশুতীর্থ সূর্যসেন কলোনীর রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনীর সারদা শিশুতীর্থের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে খালপাড়া পূর্ব বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাখিপূর্ণিমার শুভদিনে সমবেত হয়েছিলেন বিদ্যালয়ের সেই সময়কার বিদ্যার্থীরা, বিদ্যালয়ের দাদা-দিদি ও ভাই-বোনেরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর অমিত জৈন এবং প্রবীণ অভিভাবক ভিকি প্রসাদ বীরেন্দ্র। এছাড়াও ছিলেন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা প্রধান আচার্য বিমলকৃষ্ণ দাস, বর্তমান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস, বর্তমান সম্পাদক প্রদীপ সাহা। সকলেই বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ এবং আজকের দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। এই ছোট্টো মনোরম অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ভাই-বোন যাঁরা আজ সমাজের বিভিন্ন দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা কীভাবে তাঁদের জীবনের পাথেয় হয়ে আছে, তার স্মৃতি রোমন্থন করেন। বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে এই বিদ্যালয়ের দীর্ঘ সময়ব্যাপী সমাজে অনন্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। আজকের অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পুরাতন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, যা পূর্বক্ষেত্রের প্রথম বিদ্যালয়, তার পবিত্র মাটি একটি কলসে সংগ্রহ করা হয়। এই মাটি বর্তমান বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে সকলেই পার্শ্ববর্তী এলাকায় মানুষের হাতে রাখি পরান। বর্তমান বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এনজেপি অঞ্চলে এবং ঠাকুরনগর এলাকায় নাগরিকদের হাতে রাখি বাঁধা হয়। বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনুপ কুমার মণ্ডল।

সংস্কৃত সপ্তাহ সমারোহের সমাপন অনুষ্ঠান

গত ১৫ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা বিদ্যাভারতী বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ অয়োজিত সংস্কৃত সপ্তাহ সমারোহের সমাপন অনুষ্ঠান অনলাইন মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সংস্কৃতভাষার গুরুত্ব ও ব্যবহারিক দিককে কেন্দ্র করে শিশু মন্দিরগুলির আচার্য- আচার্যরা বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া শিশু মন্দিরের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংস্কৃতে মঙ্গলাচরণ, মাতৃবন্দনা, সুভাষিতম্, গান ইত্যাদি পরিবেশন করেন। ৪০ জন অংশগ্রহণকারী সক্রিয়ভাবে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে অংশগ্রহণ করেন বিদ্যাভারতী পূর্বক্ষেত্রের শিক্ষা বিভাগের অবসর প্রাপ্ত আধিকারিক গোপাল চন্দ্র হালদার। প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কালিনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষিকা ডঃ মৌমিতা বর। বিশেষ অতিথিরূপে ছিলেন বিদ্যাভারতী পূর্বক্ষেত্রের সহ সংগঠন সম্পাদক পার্থ ঘোষ। এছাড়াও ছিলেন বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের প্রবাসী কার্যকর্তা দেবাংশু কুমার পতি, পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি বিবেকানন্দ শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য তথা প্রান্ত প্রমুখ দীপঙ্কর চক্রবর্তী, বর্ধমান ক্ষুদিরামপল্লী সারদা শিশু মন্দিরের আচার্যা তথা সহ প্রান্ত প্রমুখ শ্রীমতী মৌমিতা পাল সামন্ত এবং বাঁকুড়া জেলার খাতড়া সরস্বতী শিশু মন্দিরের আচার্যা তথা সহ প্রান্ত প্রমুখ শ্রীমতী শেফালী মাহাত।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পশ্চিমবঙ্গের একটি সংস্কৃত পরিবার--- ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ প্রণব বর, তাঁর সহধর্মিণী ডঃ মৌমিতা বর এবং তাঁদের দুই সংস্কৃত-মাতৃভাষী সন্তান এই অনলাইন সমারোহে যোগদান করে অনুষ্ঠানকে এর ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সাবলীলভাবে সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় সঞ্চালনা করেন হায়দরাবাদ আইআইটি'র সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক তথা পূর্বতন আচার্য বিশ্বরূপ বেজ।

চুড়কা মুর্মু বলিদান দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৮ আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট খণ্ডের ভাটপাড়া মণ্ডলের চকরামপ্রসাদ গ্রামের চকরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৭১-এর হুতাত্মা বীর চুড়কা মুর্মুর ৫৫তম বলিদান উপলক্ষ্যে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় চুড়কা মুর্মু সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে।

শুরুতে তাঁর সমাধিস্থলে এবং বিদ্যালয়স্থিত

স্মৃতিস্মারক বেদীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক রবিকান্ত বর্মন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সমস্ত স্বয়ংসেবক এবং মুর্মু পরিবারের সদস্য-সহ প্রতিটি গ্রামবাসী।

বড়োদের তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা, তরুণ ও বালকদের কবাডি প্রতিযোগিতা, শিশুদের মোরগ লড়াই, জল-স্থল এবং মায়েদের জন্য স্টেশন খেলা, বল দিয়ে লক্ষ্যভেদের মতো আকর্ষণীয় খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণের পর সঙ্ঘের প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সে স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আলোচনা সভা

গত ১৭ আগস্ট স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের উইলিয়ামসন মেজর হলে ‘ The New World Order -- Emerging Bharat’ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন The New World 21st Century Global Order And India পুস্তকের লেখক তথা India Foundetion-এর প্রেসিডেন্ট ডঃ রাম মাধব। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বিশ্বভ্রাতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। মঞ্চস্থ অতিথিরা ভারতমাতা, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। উপস্থিত মাতৃমণ্ডলী শঙ্খধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত করে তোলেন। এর পর সরস্বতী বন্দনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। বক্তব্য রাখেন স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা তথা স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সহ সংযোজক ধনপতরাম আগরওয়াল, ডঃ রাম মাধব এবং সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী। সভায় অংশগ্রহণ করেন ভারত সরকারের রবার বোর্ডের পূর্বতন চেয়ারম্যান ডঃ সাওয়ার ধনধনিয়া, কমল সোমানী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি। সভা সঞ্চালনা করেন প্রিয়াংশী আগরওয়াল।

আত্মোন্নতি-আর্তত্রাণ সমিতি ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ১৬ আগস্ট স্মরণ

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের নরখাদক-জেহাদিদের দ্বারা গণহত্যা এবং রক্তস্নানের সাক্ষী হয় গোটা কলকাতা। 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'- এর ডাক দিয়ে হিন্দুদের বাড়িঘর, সম্পত্তিতে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে জেহাদিরা। চলে নির্বিচারে হিন্দুহত্যা, হিন্দু নারীদের সম্ভ্রমহানি। এরপরই শুরু হয় বিপ্লবী বীর গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিজয় সিংহ নাহার, রাম চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় দত্ত, যুগলকিশোর ঘোষের নেতৃত্বে পালটা প্রতিরোধ। সেই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ দিবসের ৮০ বছর পূর্তি এবং রডা কোম্পানির অস্ত্র বিপ্লবীদের হস্তগত হওয়ার ১১১ বছর পূর্তি উদ্‌যাপিত হলো গত ১৬ আগস্ট। আত্মোন্নতি-জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতি এবং বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পরিচালনায় মধ্য কলকাতায় মলঙ্গা লেন-স্থিত ত্রিকোণ পার্কে এদিন একটি প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এদিন সভার সূচনা হয়। 'বন্দেমাতরম' গেয়ে শোনান বিপ্লবী হৃষীকেশ চক্রবর্তীর পৌত্রী মিঠু চক্রবর্তী। সভায় উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের চেয়ারম্যান এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধা সুভাষ চক্রবর্তী, বেঙ্গল

ভলান্টিয়ার্সের সাধারণ সম্পাদক অনিমিত্র চক্রবর্তী, বিশিষ্ট আইনজীবী প্রসূন মৈত্র, বিশিষ্ট সাংবাদিক কুণাল বসু, নেতাজী গবেষক সৈকত নিয়োগী, বিশিষ্ট লেখক সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত এবং বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শান্তনু মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও এদিন সভায় বক্তব্য রাখেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য নিলয় ভট্টাচার্য ও অর্ঘ্যরাজ চট্টোপাধ্যায়। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে একই বিপ্লবী পরম্পরার দ্বারা ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট রডা কোম্পানির মাউজার পিস্তল-সহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হওয়া এবং ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টের মুসলিম লিগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি বিপ্লবীদের আগ্নেয় প্রতিরোধের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। সভামঞ্চে এদিন স্মরণ করা হয় আত্মোন্নতি সমিতি, যুগান্তর দল, অনুশীলন সমিতি, বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি, শ্রীসঙ্ঘ, মুক্তিসঙ্ঘ, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মতো বিপ্লবী সংগঠনগুলির অবদান। প্রমথনাথ মিত্র, পুলিনবিহারী দাশ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ঘোষ, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রলাল খাঁ, হরিদাস দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দীর মতো বিপ্লবীদের বীরগাথা স্মরণের সঙ্গে আলোচিত হয় গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্, নোয়াখালির গণহত্যা এবং দেশ বিভাজনের রক্তাক্ত ইতিহাস। বর্তমানে ওপার ও এপার বঙ্গে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে জেহাদিদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালি বিপ্লবীদের সর্বাত্মক প্রতিরোধের ইতিহাস স্মরণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এদিনের সভায় বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়। এই সভায় প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত হয়েছিলেন।

মাদপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

গত ১৬ আগস্ট পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবের আয়োজন করা হয়। এদিন শিশু মন্দিরের ৩০০ ভাই-বোন শ্রীকৃষ্ণ সাজে সজ্জিত হয়ে মাদপুর বাজার পরিক্রমা করে। পরে শ্রীকৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বাজারে প্রভাত ফেরির সময় সাধারণ মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো ছিল। দূরদর্শন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে পুরো অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশু মন্দিরের সম্পাদক জয়দেব দাস, শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য শ্রীমতী মৌমিতা চক্রবর্তী, রাষ্ট্রীয়

স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগ ব্যবস্থা প্রমুখ প্রণবেশ কুমার কর, শিশু মন্দির পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য নিমাই নন্দী।

ফঃ ৪

ভাটপাড়া ও জগদ্দলে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব উদ্‌যাপন সমিতি'র উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

গত ১৭ আগস্ট 'শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব উদ্‌যাপন সমিতি'র উদ্যোগে এবং উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া ও জগদ্দল নগরের স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এবার এই শোভাযাত্রা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করল। এদিন উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলের সার্কাস মোড় থেকে ধর্মীয় শোভাযাত্রাটি তার যাত্রা শুরু করে বলরাম সরকার ঘাট পর্যন্ত যায়। সেখানের ননীর হাঁড়ি ভাঙার মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রাটির পরিসমাপ্তি ঘটে। অসংখ্য সাধারণ মানুষ এদিন এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

ইছাপুরে স্থানীয় যুবকদের প্রচেষ্টায় ধর্মান্তরণ রোধ

গত ১৪ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরে ২০ নং রেলগেটের কাছে অবস্থিত তিলক হেলার বাড়িতে চলছিল প্রায় ১৫০টি পরিবারকে ধর্মান্তরণের অপপ্রয়াস। জোর খাটিয়ে এবং প্রলোভন দেখিয়ে এই দরিদ্র পরিবারগুলিকে খ্রিস্টমত গ্রহণে বাধ্য করার চেষ্টা চলছিল। স্থানীয় যুবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, তৎপরতা এবং ধর্ম জাগরণ সমন্বয়, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার কার্যকর্তাদের সহযোগিতায় ধর্মান্তরণের এই প্রয়াস রুখে দেওয়া সম্ভবপর হয়। এরপর, গত ১৯ আগস্ট এই অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে শ্রীহনুমান চালিশা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিতরণ করা হয়। তিলক হেলা এবং তার পরিবারকে স্থানীয় যুবকদের পক্ষ থেকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় গত জুন মাসে এই জেলার শ্যামনগরে প্রায় ২০০টি পরিবারকে ধর্মান্তরণের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

শিলিগুড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপন

আজ থেকে ৬০ বছর আগে ১৯৬৩ সালে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা হয়। এবছরও শিলিগুড়ি জেলার ১৪টি প্রখণ্ডের ১৫ স্থানে ৬১তম স্থাপনা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উত্তরবঙ্গ প্রান্তের মূল অনুষ্ঠান হয় ১৫ আগস্ট শিলিগুড়ির হায়দরপাড়াস্থিত ভারতমাতা মন্দির কার্যালয়ে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিকেল ৩টায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভারতমাতার পূজার মধ্য দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল এবং প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী অনুপ কুমার মণ্ডল। পরিষদের অন্যান্য কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। পূজার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজন কীর্তন চলতে থাকে।

অন্যদিকে মন্দিরের পার্শ্ববর্তী প্রণামী বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বালক-বালিকাদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা। এছাড়াও ছিল দহী-হাণ্ডি প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি চোখে পাড়ার মতো ছিল। সন্ধ্যায় সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নাগরিক বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচি

গত ১৭ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলের সার্কাস মোড়ে নাগরিক বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় একটি রক্তদান কর্মসূচি। এই মহতী কার্যক্রমে রক্তদান করেন ১১২ জন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত সহ-সংযোজক দেবাশিস চক্রবর্তী, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন সিংহ, রাজেন্দ্র সাউ, সুমন পাল-সহ ধর্ম জাগরণ সমন্বয়, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সমিতি এবং ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সমিতির সদস্য ও কার্যকর্তারা। তাঁরা বলেন যে, এই কর্মসূচি হলো জাতীয় ঐক্য এবং সমাজ কল্যাণের প্রতি নাগরিক বিকাশ পরিষদের অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন জয়প্রকাশ সাহ, শিব সোনার, অমিত সাও, রত্নেশ সিংহ এবং নাগরিক বিকাশ পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচিটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

বিবেকানন্দ গ্রাম বিকাশ সমিতির শোভাযাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতা

গত ১৬ আগস্ট, হুগলী জেলার সামন্তখণ্ডে তাজপুর গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের যোজনায় এবং বিবেকানন্দ গ্রাম বিকাশ সমিতির পরিচালনায় ৯টি গ্রামে উদ্‌যাপিত হয় শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। এই উপলক্ষ্যে নানা দিক থেকে অনগ্রসর এই অঞ্চলে একাধিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এই এলাকার প্রায় ৪০০ জন শিশু ভাই-বোন এদিন শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা সাজে সজ্জিত হয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। সুসজ্জিত এই শোভাযাত্রা শেষে শিশু কৃষ্ণ- রাধিকাদের আরতি করা হয়।

৯টি স্থানেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকা সাজে সজ্জিত শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্বামী বিবেকানন্দের ল্যামিনেশন করা ছবি। অংশগ্রহণকারী শিশু কৃষ্ণ ও রাধিকা-সহ প্রায় ১২০০ জনকে মিষ্টিমুখ করানো হয়।

INTO YOUR LIFE
SURYA
INTO YOUR LIFE, WE BRING LIGHT, WARMTH, & STRENGTH.
INTO YOUR LIFE, WE BRING SURYA ROSHNI.
Surya Roshni is the trusted companion bringing light, warmth, and care to every moment.
From purity in every sip to safe spaces, we bring innovation and reliability into your life.
Let's brighten up your world together!
Consumer Lighting | Steel & PVC Pipes | Fans | Appliances | Professional Lighting
I am SURYA | 50 YEARS OF TRUST | DURABLE PRODUCTS | ASSURED QUALITY
SURYA ROSHNI LIMITED | www.surya.co.in | surya surya_roshni surya.roshni surya-roshni
Email: info@surya.in Tel.: +91-11-47108000

জাতি-জনজাতির মিলনক্ষেত্র শ্রীশ্রী মা ত্রিপুরেশ্বরী

অপু সাহা।। সেই আনন্দঘনময় দিন। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দের কার্তিক মাসের অমাবস্যায় মা ত্রিপুরেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মন্দিরটি একান্ন পীঠের এক পীঠ। পুরাণমতে শিব যখন সতীদেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন, তখন শ্রীবিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীদেহকে খণ্ডবিখণ্ড করেন। সতীদেহের পবিত্র অংশ যে স্থানে পতিত হয়েছিল, সেই সকল স্থান মহাপীঠে পরিণত হয়। পীঠমালা তন্ত্রানুসারে—

'ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।

ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ।।' অর্থাৎ, ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ

পদ পতিত হওয়ায়, সেখানে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বিরাজমান। উদয়পুর নগরে ভৈরবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

মন্দির প্রাঙ্গণের আকৃতি কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপের মতো, সেজন্য এই পীঠ কূর্মপীঠ নামেও পরিচিত। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কত রাজা, মহারাজা চলে গেলেন, মন্দিরের কত পরিবর্ধন ও পরিবর্তন হলো, কিন্তু মা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। মায়ের পূজার রীতিনীতি একই পদ্ধতিতে চলমান।

উদয়পুরে মা ত্রিপুরেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠা করার আগে যে স্থান থেকে আনা হয় তার বর্তমান স্থল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের নিকটবর্তী বরাক কুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ দেওয়ান রচিত 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুররাজ ধন্যমানিক্য চট্টগ্রামের সদরঘাট হতে মা মাগধেশ্বরীর মূর্তি নিয়ে উদয়পুরে স্থাপন করার উল্লেখ রয়েছে। এই তথ্যানুসারে জানা যায়, ত্রিপুরেশ্বরীর আদি নাম ছিল মাগধেশ্বরী। উদয়পুরে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর নাম হয় শ্রীশ্রী ত্রিপুরেশ্বরী। ৫০০ বছর আগে থেকে এই পীঠস্থানটি সকল স্তরের মানুষের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

মন্দিরের ইতিহাস ঃ উদয়পুর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি। মন্দিরটি কচ্ছকাকৃতি। মন্দিরের মূল ফটক পশ্চিমদিকে। তারপর চাতাল, আবার সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের মূল চাতালে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের উত্তর দিকে

একটি দরজা আছে। উত্তর দিকের মূল ফটকের পরেই আছে শিবমন্দির। তবে শিবলিঙ্গটি ভৈরবের নয়। মন্দির থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে ভৈরবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরের বর্ননা ঃ প্রথমটি বলিঘর। দ্বিতীয়টি নাটমন্দির। সর্বশেষ মায়ের গর্ভগৃহ। সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিন গুণের ভিত্তিতে মন্দিরটি ভাগ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই তিন গুণেই মা গুণাতীত। প্রথমেই বলিঘর যা তমোগুণের প্রতীক। দ্বিতীয় অংশটি নাটমন্দির যেটি ব্রজমন্দির নামে পরিচিত। এখানে মায়ের আরাধনা, সংগীত, স্তোত্র পাঠ করা হয়। সর্বশেষ মায়ের গর্ভগৃহ যেটি সত্ত্বগুণের আধার।

মূল মন্দিরের গঠনটি নয়নাভিরাম। মন্দিরের গঠন ত্রিপুরার নিজস্ব স্থাপত্যের প্রকাশ। চারচালাকৃতি দেবালয়, সম্পূর্ণ পোড়া মাটির তৈরি। গর্ভগৃহের উভয়পাশে একটি করে দরজা আছে। মন্দিরের ভেতরের পরিমাপ ১৬ x ১৬ ফুট। বাইরের পরিমাপ ২৪ x ২৪ ফুট। চারপাশের দেয়াল ৮ ফুট চওড়া। উচ্চতা ৭৫ ফুট। মন্দিরের উপরের গম্বুজ বৌদ্ধরীতি অনুকরণে নির্মিত। এর উপর সপ্তকলস। তার উপরে ধ্বজদণ্ডে পিতলের পতাকা শোভমান।

পশ্চিম দিকের দরজা ব্যবহৃত হয় মায়ের দর্শনের জন্য। নাট মন্দির থেকে মায়ের অপরূপ দর্শন পাওয়া যায়।

দেবী ঃ মায়ের প্রতিমাটি কষ্টিপাথর দিয়ে নির্মিত। বিগ্রহটি উচ্চতা ১ মিটার ৫৭ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ৬৪ সেন্টিমিটার। দেবী শায়িত শিবের বুকের উপর পা দুটি স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছেন। দেবীর চার হাত। বাঁ দিকের উপর হাতে খড়্গ এবং নীচের হাতে অসুর মুণ্ড। ডান দিকের উপর হাতে বরমুদ্রা এবং নীচের অভয়মুদ্রা। মুখমণ্ডল লম্বাটে, চোখ দুটি তুলনামূলকভাবে ছোটো। নাক চ্যাপ্টাকৃতি ও ছোটো। মাথায় মুকুট ও জটারাশি।

মাতৃপূজা ঃ সম্পূর্ণ তন্ত্রমতেই দেবীর পূজার্চনা হয়। মন্দিরটি ৫০০ বছরের অধিকাল পুরনো হলেও পূজার্চনার নিয়মাবলী অপরিবর্তনীয়। প্রথমে মঙ্গলারতি, তারপর একে একে বাল্যভোগ, মাতৃস্নান, মাতৃপূজা, বলি (ঐতিহ্য অনুযায়ী দশমী তিথি ছাড়া প্রতিদিন বলি হয়), অঞ্জলি, অন্নভোগ। মন্দিরের গর্ভগৃহ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়। এরই মাঝে অন্নভোগ বিতরণ করা হয়, সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি (১ বৈশাখা থেকে ৩১ আশ্বিন পর্যন্ত সন্ধ্যা ৭টা এবং ১ কার্তিক থেকে ৩ চৈত্র পর্যন্ত সন্ধ্যা ৬ টায়) এরপর শীতল ভোগ, সর্বশেষ শয়নারতি।

বিশেষ পূজার্চনা ঃ নিত্য পূজার পাশাপাশি বিশেষ তিথিতে বিশেষ পূজা করা হয়।

দীপাবলী ঃ দীপাবলির সময় মন্দিরের চারপাশে উৎসবমুখর হয়ে উঠে। সেই দিন দুটি পূজা দেওয়া হয়। প্রথমে নিশি পূজা। নিশি পূজান্তে দীপাবলী পূজা। এই মনোরম অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্য রাজ্য, বহিঃরাজ্য ও অন্যান্য দেশ থেকে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। এছাড়াও অষ্টমী পূজা, মহালয়া এবং প্রতি মাসের অমাবস্যায় বিশেষ পূজা করা হয়।

পরিচালন ব্যবস্থা ঃ আগে মন্দির পরিচালন করার অধিকার ছিল রাজ পরিবারের হাতে। কিন্তু বর্তমানে রাজ্য সরকার মন্দির পরিচালনা করে। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির উন্নয়ন কমিটি এবছরের ২১ মে থেকে 'মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির উন্নয়ন কমিটি'তে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদে আসীন।

মাতাবাড়ীর পেড়া ঃ মাতাবাড়ীর পেড়ার বিশেষ গুণ রয়েছে। এই পেড়া স্বাদে যেমন সুস্বাদু তেমনি অনেকদিন রাখা যায়। নষ্ট হয় না। রাজ্যের কোথাও এমন সুস্বাদু পেড়া পাওয়া যায় না। মাতাবাড়ীর অন্যতম আকর্ষণ এই পেড়া। প্রায় ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই পেড়ার ব্যবসা চলে আসছে।

কল্যাণ সাগর ঃ মন্দিরের পূর্বদিকে এই বিশাল দীঘিটি রয়েছে। এই দীঘিটি মহারাজা কল্যাণ মাণিক্যের (১৬২৫-১৬৬০ খ্রিঃ) আমলের। এই দীঘিটি ৬.৪ একর জুড়ে রয়েছে, দৈর্ঘ্যে ২২৪ গজ এবং প্রস্থে ১৬০ গজ। এই দীঘিটি মন্দিরের সৌন্দর্যায়নে অনন্য মাত্রা যোগ করেছে। দীঘিটির চারপাশ বাঁধানো। এই দীঘিটি কচ্ছপ, মাছ ও অন্যান্য প্রজাতির জলজ প্রাণীতে পরিপূর্ণ। ভক্তরা এইসব জলজ প্রাণীদের দীঘির পাড় থেকে বিস্কুট, মুড়ি ইত্যাদি কিনে খাওয়ান। কথিত, কল্যাণ সাগরের কচ্ছপরা মৃত্যুর সময় সিঁড়ি বেয়ে মায়ের মন্দিরে উঠে মৃত্যুবরণ করে।

মন্দির সংস্কার ঃ মায়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেশ কয়েকবার মন্দির সংস্কার করা হয়। ১৬৮১ সালে একবার সংস্কার করা হয়। তাছাড়া উদয় মাণিক্যের রাজত্বকালে মন্দির সংস্কার করা হয়। তাছাড়া ১৭৭৯ সালে এবং ১৯০৪ সালে রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য কর্তৃক মন্দির সংস্কার করা হয়। বর্তমানে স্বদেশ দর্শন (।।) এবং প্রসাদ প্রকল্পের মাধ্যমে মাতাবাড়ি উন্নয়নের কাজ চলমান।

জন্মলগ্ন থেকেই মাতাবাড়ি সম্প্রতির মিলন ক্ষেত্র। যুগ যুগ থেকেই জাতি-জনজাতি উভয়ের মিলন ক্ষেত্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

মণিপুরী হলেও ত্রিপুরী সংস্কৃতির অঙ্গ লাইনিংথৌ পাংখাবা মন্দির

ইন্দ্রজিৎ সাহা

রাজন্য ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত লাইনিংথৌ পাখাংবা বা পাগলা দেবতা মন্দির মোটর স্ট্যান্ডের একটু আগে অবস্থিত। এটি ত্রিপুরায় একখণ্ড মণিপুর। ত্রিপুরায় রাজপরিবার মণিপুর রাজপরিবারে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মণিপুরী রানিরা তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে যুক্ত করেছিলেন, তার একটি নিদর্শন এই মন্দির।

পাখাংবা মণিপুরী মেইতেই জনগোষ্ঠীর একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। তিনি প্রাচীন সর্প-ড্রাগন দেবতা হিসেবে পরিচিত। এই দেবতা মহাজাগতিক শক্তির প্রতীক। পাংখাবাকে মেইতেই জনগোষ্ঠীর একজন আদিম দেবতা হিসেবে ধরা হয়। তবে মণিপুরীদের দেবতা পাখাংবা সাধারণত মন্দিরে পূজিত হন না।

এই লাইনিংথৌ পাখাংবা মন্দির বা পাগলা দেবতা মন্দির প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি কাহিনি আছে। ত্রিপুরার রাজপরিবারে রাধাকিশোর জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়ায় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু সমরেন্দ্রনাথের প্রতি মহারাজ যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন। পাত্র-মিত্রদের বুঝিয়ে দিতেন যে তার প্রিয়তমা পত্নী ভানুমতীর গর্ভের সন্তান সমরেন্দ্রনাথই তাঁর অধিক প্রিয়। কলকাতার সফরে অধিকাংশ সময় তিনি সমরেন্দ্রনাথকেই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মাতা রাজেশ্বরী তা বুঝতেন। নিংথৌজা রাজবংশের রাজারা পাখাংবাকে তাদের পূর্বপুরুষ এবং প্রধান দেবতা হিসেবে মনে করতেন। মাতা রাজেশ্বরী যুবরাজ রাধাকিশোরের ভবিষ্যতের অমঙ্গল চিন্তায় পাখাংবা দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পরবর্তী সময়ে রাধাকিশোর রাজা হলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি পাখাংবা দেবতার পূজা দেন। সেই সময়েই মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য এই মন্দিরটি নির্মাণ করে পাখাংবা দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে অনেকে মনে করেন মহারানি রাজেশ্বরীই পাখাংবা মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দিরটির গঠনশৈলী অনেকটা ত্রিপুরার অন্যান্য মন্দিরের রীতিতেই গড়া। মন্দিরটির চূড়ায় রয়েছে একটি সর্পপ্রতীক। মন্দিরে বর্তমানে দেবতা পাখাংবার যে মূর্তি আছে তা পিতলের তৈরি। মূর্তিটি রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহের সৃষ্টি। বুদ্ধিমন্ত সিংহ ‘ত্রিপুরার মনিপুরী নৃত্যশিল্পী এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। মন্দিরে প্রতি শুক্রবারে পূজা হয়। তবে পাখাংবার সঙ্গে মন্দিরের সিংহাসনে লাইসানা লাইরাংবিকেও পূজা করা হয়। এ পূজার নৈবেদ্যর থালায় আস্ত ফলমূলই থাকে। এ পূজায় ফলমূল কেটে দেওয়ার রীতি নেই।

প্রতি শুক্রবারের পূজার নৈবেদ্য থালায় কোনো অন্নভোগ দেবারও কোনো রীতি নেই। নেই বলিপ্রথাও। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে মন্দিরের মূল দরজা বন্ধই থাকে। মূল মন্দিরের সামনেই রয়েছে শিবমন্দির, যা পাগলা দেবতা মন্দিরেরই অংশবিশেষ। শিবমন্দিরে প্রতিদিনই পূজা হয়। পাগলা দেবতা মন্দিরের প্রবেশ পথেই নুংজেম পোখরি নামক একটি বড়ো জলাশয়ও রয়েছে, যা মন্দিরে একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক ছোঁয়া আনে। মণিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, পাখাংবা এই পবিত্র পুকুরের তলদেশ দিয়ে এই মন্দিরে যাতায়াত করেন। মণিপুরের কাংলা দুর্গে অবস্থিত নুংজেম পোখরি নামক পবিত্র পুকুরেই পাখাংবা দেবতার বাসস্থান রয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে মহাআড়ম্বরে মন্দির প্রাঙ্গণে মণিপুরী ঐতিহ্যবাহী উৎসব ‘লাইহারোবা’ পালিত হয়, যা শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এই সময় পাখাংবা দেবতার কাছে নৈবেদ্যর থালায় অন্নভোগও নিবেদন করা হয়। এ সময় পাখাংবা দেবতার অনুচরদের উদ্দেশ্যে কাঁচা মাছও নিবেদন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবটি প্রবর্তন করেছিলেন মহারানি রাজেশ্বরী।

পাখাংবা মেইতেই সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তার পূজা মণিপুরী সমাজে প্রচলিত। পাখাংবা দেবতার এ মন্দিরটি পাগলা দেবতার মন্দির নামেই অধিক পরিচিত। কিন্তু এই নামকরণের কারণ কী, তা জানা যায় না। □

অগ্নিযুগের বিপ্লবী
বারীন্দ্র কুমার ঘোষ

দীপক খাঁ

শ্রীঅরবিন্দ অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এক বিশিষ্ট সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁকে বিপ্লবীযুগের এক অগ্নিপুরুষ বলা হয়। বারীন্দ্রকুমারের বাবা ইয়ং বেঙ্গলের উত্তরসাধক ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ। সুচিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল তাঁর। বারীন্দ্রকুমারের মা স্বর্ণলতা দেবী যিনি আরার মন্ত্রদ্রষ্টা মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। জাতীয় রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোর বারীন্দ্রকুমার এমন কিছু বিশিষ্ট শিক্ষকের সম্পর্শে আসেন যাঁরা জাতীয়তাবোধের আদর্শ। তাঁদের মাধ্যমেই বারীন্দ্রকুমার পরাধীন ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থার কথা জানতে পারেন। বারীন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহচররা বলে থাকেন, বারীন্দ্র চুপচাপ বসে থাকতেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, সবসময় তার মনের মধ্যে কী একটা ব্যাকুলতা, আমাদের মতো অহেতুক ছেলেমানুষি হই-হুল্লোড় মত্ত থাকতেন না।

তখন শ্রীঅরবিন্দ ইংল্যান্ড থেকে ফিরে বরোদায় অধ্যাপনা করছেন। যশস্বী মহলে যথেষ্ট সম্মান আছে তাঁর। ভাই বারীন্দ্রকুমার দাদার কাছে আসেন ব্যবসার মূলধনের আশায়। বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে এসে একেবারেই পালটে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়—তিনি বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামের বীরযুবক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন—পরবর্তীকালে তারই নাম হয় নিরালম্ব স্বামী। যতীন্দ্রনাথ বরোদায় এসে সৈন্য বিভাগে কাজ নিলেন। গোপনে মিলিটারি ট্রেনিং নিয়ে নিজেকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। তারই প্রভাবে অরবিন্দ বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে ভারতে আবির্ভূত হলেন। বারীন্দ্রকে তিনি তাঁর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন। বারীন্দ্র দাদার আদেশকে শিরোধার্য করে সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতা এলেন।

মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে যুগান্তর দলের গোপন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বারীন্দ্র এসে এই কেন্দ্রের দায়িত্ব হাতে নিলেন। অবিনাশ ভট্টাচার্য, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলালদের সঙ্গে নিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুললেন। বারীন্দ্রের কাজ ছিল বিভিন্ন শাখার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা, শুধু তাই নয়, গুপ্ত সমিতিগুলিকে লাঠি খেলা, তলোয়ার চালনা, সাইকেল চালানো, অশ্বারোহণ, বক্সিং, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। কিছুদিন বাদে যতীন্দ্রর সঙ্গে বারীন্দ্রের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অরবিন্দ কলকাতায় এসে এই সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে ছিলেন।

পূর্ববঙ্গের লেফটেনান্ট গভর্নর ফুলার ছিলেন খুবই অত্যাচারী। তার নির্দেশে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত বহু মানুষ নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলেন। বারীন্দ্রের ওপর একটি গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়, যে করেই হোক ফুলারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। তিনি রংপুরে গেলেন। প্রফুল্ল চাকী নামে এক তরুণ বিপ্লবীর ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো—কিন্তু চেষ্টা করেও তিনি বিফল হলেন. বারীন্দ্রর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, মজফ্ফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করা। এজন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে নির্বাচন করা। এ কাজে তাঁরা সফল হন নি। মৃত্যুবরণ করে ভারতের বুকে প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। ইংরাজ সরকার কুখ্যাত দমননীতি প্রয়োগ করল। একটির পর একটি গুপ্ত ঘাঁটিতে অভিযান চালাল।

মানিকতলার মুরারি পুকুর বাগানে গুপ্তঘাঁটি পুলিশ আবিষ্কার করল। পাওয়া গেল বোমা তৈরির যন্ত্রপাতি, ডিনামাইট, বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল এবং বিভিন্ন বই ও কাগজপত্র। অনেক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার মধ্যে অরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, নরেন গোঁসাই, চারুচন্দ্র রায়, অবিনাশ ভট্টাচার্য সমেত চৌত্রিশ জন।

এই মামলা আলিপুর বোমার মামলা নামে খ্যাত হয়। এই মামলা চলাকালীন বারীন্দ্র পুলিশের কাছে একটি সাহসোচিত স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে বারীন্দ্র দেশের জনগণের চোখে বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। ফল হলো উল্‌টো জনগণের চোখে এই স্বদেশী নায়করা হলেন ডাকাত—ইংরাজরা সুকৌশলে এই অপপ্রচার করেছিল।

বারীন্দ্র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তিনি অরবিন্দকে আলাদা রাখলেন। তিনি জানতেন অরবিন্দ দেশের সম্পদ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অক্লান্ত চেষ্টায় বিচারে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তখন তিনি ঋষি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। শেষ অবধি বারীন্দ্রের মৃত্যুদণ্ড হয়। তার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। এখানে মৃত্যুদণ্ডের বদলে সাজা দেওয়া হয় যাবজ্জীবন দীপান্তর—তাঁর সঙ্গে উল্লাসকর দত্তকেও দেওয়া হয় দ্বীপান্তর।

বারীন্দ্র কুমার ১৯০৯-১৯২০ সাল পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন। ১৯২০ সালে বারীন্দ্রকুমার মুক্তি পান। তারপর পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে বেশকিছুদিন ছিলেন। ১৯৫০ সালে হয়েছিলেন দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক। বারীন্দ্র কুমারের লেখা একাধিক গ্রন্থ বাংলা গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন---‘অগ্নিযুগ’, ‘ঋষি রাজনারায়ণ’, ‘দ্বীপান্তরের বাঁশি’, ‘আমার আত্মকথা’, ‘দ্য টেল অফ মাই এক্সাইল’ এবং ‘শ্রী অরবিন্দ’ ইত্যাদি।

১৯৫৯ সালের ১৮ এপ্রিল ভারতমাতার দামাল ছেলে মহান বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ অমৃতলোক গমন করেন। □

ইচ্ছে হলে যে কেউ রাজনৈতিক হারিকিরি করতেই পারে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সেটাই করেছিলেন। আপন খণ্ড রাজনৈতিক, কৌম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার লক্ষ্যে অনুগামীদের বিপথে পরিচালিত করা ঠিক নয়। যোগেন্দ্রনাথের মতো পরে পস্তানোর চেয়ে আগে ভাগে সতর্ক হওয়া ভালো নয় কি?

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কয়েকদিন আগের কথা। সন্ধ্যেবেলা। টিভি খুলেছি খবর দেখার জন্য। দেখানো হচ্ছে— হাওড়ার কোনো একটি গ্রামের মানুষজন কান্নাকাটি করছেন। তাদের অভিযোগ— এলাকায় অফিস করে থাকা জনৈক চিটফান্ডের মালিক তাদের টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। দেখছি আর ভাবছি! রেট্রোসপেকশনে দেখছি— ১৩-১৪ বছর আগের চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে হইচই, সর্বস্বান্ত মানুষের আত্মহত্যা, বিলাপ। সারদার সুদীপ্ত এখনো জেলে, রোজভেলির চেয়ারম্যান গৌতম কুণ্ডু এখনো আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ মুক্ত নন। লোভ কী বিষম বস্তু! এতো সবের পরেও এই অল্প সময়ান্তরে কতিপয় মানুষ আবার সেই একই ফাঁদে জড়ালেন? এটাই কী শাশ্বত মানব চরিত্র? আর্থিক লোভ, নাম-যশ প্রাপ্তির নিঃশব্দ রিপু আক্রমণ অনেক বোদ্ধা বিদগ্ধ মানুষকেও নির্বুদ্ধিতার বৃত্তে ফেলে বিচাররোধহীন এক যন্ত্রে পরিণত করে।

ব্যক্তি মানুষ লোভে পড়ে সর্বস্বান্ত হলে তার প্রভাব শুধুমাত্র তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপরে পড়ে। কিন্তু একজন নেতৃস্থানীয় মানুষ যখন কোনো জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দেন, তাদেরকে উন্নয়ন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশায় পরিচালিত করেন— সেক্ষেত্রে তিনি যদি একরোখা আকাশকুসুম প্রত্যাশায়, স্ব-উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহে কালোকে সাদা দেখেন, ইতিহাসকে অস্বীকার করেন, তাহলে শেষপর্যন্ত তাঁর অনুগামীরা পড়েন আতান্তরে। আজকে বাংলাদেশের তপশিলি সম্প্রদায়-সহ সমগ্র হিন্দু সমাজ চরম অত্যাচারিত, বিপন্ন। এজন্য নিরীহ-নির্বিবাদী শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের তো আর দোষ দেওয়া যাবে না। বাংলাদেশের কোনো একজন মুসলমানও বলতে পারবেন না— হিন্দুরা আক্রমণকারী। এর জন্য দায়ী আক্রান্তের ধর্ম এবং ভারত বিভাজনের মতো ভুল সিদ্ধান্ত।

১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় বা তার পরবর্তী সময়ে পূর্ববঙ্গের বর্ণ হিন্দুদের বৃহৎ অংশ ভারতবর্ষে পালিয়ে এসেছেন, কেউ জমি জায়গা বিক্রি করতে পেরেছেন, কেউ পারেননি; অনেকে এক বস্ত্রে প্রাণ হাতে নিয়ে দেশ ছেড়েছেন। রয়ে গেছেন নমঃশূদ্রদের একটা বড়ো অংশ। এবং তদানীন্তন সময়ে যার বিপথগামী নেতৃত্ব, মিথ্যা

ফঃ ৫

আশ্বাস, এব্যাপারে তাদেরকে ভুলপথে পরিচালিত করেছিল, তিনি হলেন অবিভক্ত ভারতের একমাত্র তপশিলি বাঙ্গালি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তিনি অভিন্ন লক্ষ্যে সোরাবর্দি, মৌলানা ভাসানিকে সমর্থন করেছিলেন। তার মতে ব্রিটিশ শাসনোত্তর ভারতে বর্ণ হিন্দুদের শোষণ শাসন থেকে নমঃশূদ্র দলিত হিন্দুদের রক্ষা করার একমাত্র উপায়— আলি জিন্নার 'মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র দেশ'-এর দাবিকে সমর্থন করা। অবিভক্ত ভারত থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসা পাকিস্তানে মুসলমান ও নমঃশূদ্র একসঙ্গে হাত হাত রেখে বসবাস করবে— এই ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং সুদূরপ্রসারী দৃঢ় প্রত্যাশা। ভারত বিভাজিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই এই উপলব্ধিতে ভর করে তিনি রাজনীতির স্বপ্নজাল বোনা শুরু করেন এবং এই স্বপ্নের অধরা মাধুরীকে সাকার করার লক্ষ্যে পাকিস্তানে রয়ে যান।

১৯৩২ সালে রামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা আইন নিয়ে এলে এবং পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন'-এর অধীনে বঙ্গের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন এবং বঙ্গপ্রদেশে মুসলিম লিগ সমর্থিত সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন দেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য— মুসলিম লিগ, জিন্না সাহেব এ নিয়ে আজও পাকিস্তানের কথা আলোচনায় বেশি উঠে আসে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, মুসলিম লিগ তৈরি হয়েছিল বঙ্গপ্রদেশে এবং তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন একজন বাঙ্গালি। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে মুসলিম লিগের পতাকা প্রথম উঠেছিল বঙ্গপ্রদেশে, ঢাকায়। ১৯৩৭ সালের 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লিগ সবথেকে ভালো ফল পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে নয়, করেছিল বঙ্গপ্রদেশে। অনেকে বঙ্গ ও বাঙ্গালির ঐতিহ্যগত ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে গর্ববোধ করেন, যার জন্য কথাগুলোর অবতারণা। যাক সে কথা। পাকিস্তান তৈরি হলে যোগেন্দ্রনাথ গণপরিষদের সভাপতিত্ব করেন এবং পাকিস্তানের লিয়াকত আলি সরকারের (প্রথম সরকার) আইন মন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তার সযত্ন লালিত ভ্রান্তিবিলাস বাস্তবের কঠোর ডাঙায় আছড়ে পড়ে। তার সাধের ইউটোপিয়ান দেশ পাকিস্তানে জেহাদি ইসলামের রমরমা বৃদ্ধি পায়।

শীঘ্রই পাকিস্তান অর্থাৎ 'পবিত্র স্থানে' অপবিত্র কার্যকলাপ শুরু হয় এবং হিন্দুদের উপর দমন-পীড়ন ও অত্যাচার নেমে আসে। দেশের আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যথাসাধ্য আইনি প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারের সহযোগিতা এ ব্যাপারে তিনি পাননি। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁ তার কথা রাখেননি। নেহরু-লিয়াকত চুক্তি মোতাবেক পাকিস্তানের হিন্দুরা সুরক্ষা পায়নি। কথিত আছে, জিন্নার স্বপ্নের 'ধর্মনিরপেক্ষ পাকিস্তান'-এর ধারণাকে লিয়াকত আলি ছারখার করে দেন, দেশটিকে একটি ইসলামিক রিপাবলিক বানানোর মধ্য দিয়ে। অবশেষে ১৯৫০ সালে যোগেন্দ্রনাথ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁকে লম্বা চিঠি লিখে পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং ভারতে চলে আসেন। পরবর্তী জীবন তিনি নিতান্ত অনুশোচনায় নীরবে জীবন কাটিয়ে দেন সেই ভারতের এক অঙ্গ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে। এখানকার মানুষের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, বেশভূষার সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি দেশভাগের পর পাকিস্তানের করাচিতে বসবাস করেছিলেন। আরেক মহান বাঙ্গালি, সাহিত্যিক মধুসূদন দত্ত একই ভুল করেছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। খুব শীঘ্রই তাঁর মোহভঙ্গ হয় এবং লেখেন—

মজিনু বিফল তপে, অবরেণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!

ভারতের পূর্বাংশে বঙ্গপ্রদেশে যখন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল নমঃশূদ্রদের জন্য আন্দোলন করছেন, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম ভারতে বাবাসাহেব আম্বেদকর একই কাজ করে চলেছেন। যোগেন্দ্রনাথ বাবাসাহেব আম্বেদকরের সমর্থক ছিলেন। বাবাসাহেব ছিলেন এক ভূয়োদর্শী মানুষ। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ সেই স্তরের নেতা ছিলেন না। তাঁর উপলব্ধিতে বিস্তর ঘাটতি ছিল। মুসলিম লিগ গঠনের ইতিহাস, তার কর্মসূচি, দাবিদাওয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকার পরেও তার কল্পনা বিলাস--- 'মুসলমান-দলিত ভাই-ভাই' নামের এক পরাবাস্তব ধারণার শাখা প্রশাখা বিস্তারে সহায়ক হয়। তাঁর উপলব্ধিতে আসেনি— রক্তপিপাসু শ্বপদ শাবকদের ততদিন বিশ্বাস করা যায়, আদর করে কোলে তোলা যায়— যতদিন না তাদের দাঁত নখ পরিপুষ্ট হচ্ছে। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লিগের শ্বাপদরা ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে তাদের একসময়ের পৃষ্ঠপোষক নমঃশূদ্র-সহ সমস্ত হিন্দুদের আক্রমণ করতে কালবিলম্ব করেনি। বাবাসাহেব আম্বেদকর বিভাজন-পূর্ব পরাধীন ভারতে রাজনীতি করেছেন, আইনসভায় দলিতদের জন্য আসন সংরক্ষণের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ব্রিটিশের দাবার বোড়ে হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু ইসলামি রাজনীতি এবং তার দর্শনাভিমুখ সম্পর্কে তাঁর কোনোরূপ ভ্রান্তি ছিল না। তাই তিনি কখনোই দলিত-মুসলমান সমন্বয়ের কথা জোর গলায় বলেননি।

যদিও হিন্দুদের মধ্যে বিভাজনের ফায়দা নিয়ে তৎকালীন সময়ে বঙ্গে মুসলিম লিগের সোহরাবর্দি সরকার এবং পাকিস্তানে খিজার হায়াত সরকার গঠিত হয়। আসলে যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন এক ভিন্ন অস্তিত্ব। মূলত ব্যাপারটা এরকম— লিয়াকত আলি খাঁর লেখা চিত্রনাট্যে তিনি মন্ত্রীর পার্ট করতে মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী তথা স্ক্রিপ্ট লেখকের নির্দেশনায় বরকন্দাজ বাহিনী তার হাতের তরবারি কেড়ে নেয়। বাবাসাহেব হিন্দু ধর্মের বর্ণাশ্রম, জল চল, জল অচল, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। যার জন্য তিনি একটা সময় বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন তাঁর প্রায় আড়াই লক্ষ অনুগামী নিয়ে। গোঁড়া হিন্দদের উপর তাঁর

আস্থা ছিল না। অপরদিকে মুসলিম লিগ এবং ইসলাম সম্পর্কে তার ধারণা ছিল স্বচ্ছ। তিনি তাঁর The Partition of India গ্রন্থে বলেছেন— The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is a brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation there is nothing but contempt and enmity. 'দুঃখের বিষয়, এ জন্য সমকালীন ভারতবর্ষে একই রাজনীতির ধারায় অভিষিক্ত দুজন দলিত নেতার পরিণতি হয় দু'রকম।

উপলব্ধি ও সৈদ্ধান্তিক নির্ভুলতার কারণে একজন যখন স্বাধীন ভারতে সংবিধান প্রণয়নের সভাপতির দায়িত্ব পান, অন্যজন সীমান্তের ওপারে তার প্রিয় স্থানের বিচ্যুতি-সৃষ্ট আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। আজ যখন বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ধর্ম-বর্ণ, জাতপাত নির্বিশেষে গণতন্ত্র প্রিয় প্রতিটি ভারতবাসীর মননে এক স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন, তখন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এক বিস্মৃত নেতা, ইতিহাসের খলনায়ক হিসেবে রয়ে গেছেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষে যাদেরকে নিয়ে তিনি রাজনীতি করেছেন তাদের উত্তরসূরিরাও আজকে তাঁর নাম মুখে আনেন না। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। তীক্ষ্ণ বিচারবোধ দ্বারা সঠিক সময়ে ইতিহাসের বাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অসমর্থ হলে, যত বড়ো সাহসী ও তেজোদীপ্ত নেতা-নেত্রী হোক না কেন, ভাবীকাল তাঁকে মনে রাখবে না।

পশ্চিমবঙ্গে টুপি দাড়ি শোভিত এক নেতা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তার দলের নামে যথারীতি— অধুনা ভারতীয় রাজনীতির সর্বাধিক আলোচিত-'সেকুলার' শব্দটি স্থান পেয়েছে। এ যেন ঠিক— কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। ধর্মনিরপেক্ষতার ধার ধারে না বলেই ধর্মনিরপেক্ষতার সাইনবোর্ড দিতে হয়েছে। তারা দলিত হিন্দু এবং মুসলমানদের জোটবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা ফলাও করে বলে থাকেন। তারা শোষক বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দলিত হিন্দু সমাজকে পাশে নিতে চায়। দেখা যায় অবগুণ্ঠিত (vailed) জিন্নাপন্থী এই দলটি দলিত হিন্দুদের আর্থিক দুরবস্থা, অশিক্ষা নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে। হিন্দুদের বর্ণাশ্রম জাতিভেদ প্রথাকে গালাগালি করলেও, পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজ, আনসারী, ধুনিয়া, কুরেশিদের সামাজিক প্রান্তিকতার ব্যাপারটা এরা এড়িয়ে যায়। ভারতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো ইসলামিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ। ইদানীংকালে কর্ণাটক রাজ্যের এক স্বাধীনচেতা, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মহিলা বানু মুস্তাক বুকার পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কার সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য। তিনি ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে মুসলমান সমাজের প্রান্তজনদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন তার Heart Lamp—Selected Stories গল্প সংকলনে। সেখানে তিনি মজহবি অনুশাসনে অবদমিত নারী সত্তা এবং তাদের বন্দি জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন।

রাজনীতি করুন, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন ব্যক্তি ও কৌম স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। কিন্তু বিভেদ বিষে ভারত আত্মার ক্ষতি করা চলবে না। তাহলে সেটা একদিন নিজের দিকেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে।

জিন্না 'অসম' (unjustified) ভারত ভাগে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সখেদে বলেছিলেন যে, তাকে কীটদ্রষ্ট পাকিস্তান দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে জিন্নার অতৃপ্ত আত্মা আবার নড়াচড়া শুরু করেছে। অন্ধকারের কারবারিরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনার মতো ভারতের কোণায় কোণায় তাদের ক্রিয়াকলাপ এখন প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। দক্ষিণ ভারতের এসডিপি (নিষিদ্ধ পিএফআই-এর রাজনৈতিক শাখা), AI MiM সারা ভারতে তাদের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। অন্যদিকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের একাংশ ভক্ত এদের হাত শক্ত করার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে পড়েছে। তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয় নিধি স্ট্যালিন, উত্তর ভারতের ভীমসেনার নেতা চন্দ্রশেখর এবং পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল মহলের সমাজ আন্দোলনের নেতা 'বিজীত' কুমার যোগেন্দ্রিয় অভিলাষে ওদের হুঁকোয় মুখ রাখতে উদ্‌গ্রীব! গণতন্ত্রে সমালোচনা করা গেলেও কারও গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করা যায় না। ইচ্ছে হলে যে কেউ রাজনৈতিক হারিকিরি করতেই পারে। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সেটাই করেছিলেন। আপন খণ্ড রাজনৈতিক, কৌম উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার লক্ষ্যে অনুগামীদের বিপথে পরিচালিত করা ঠিক নয়। যোগেন্দ্রনাথের মতো পরে পস্তানোর চেয়ে আগে ভাগে সতর্ক হওয়া ভালো নয় কি? ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে। হিন্দুকুশ পর্বত, গান্ধার (বর্তমানে কান্দাহার) প্রদেশ, সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের উৎস স্থল কৈলাস, মানসসরোবর, আরাকান রাজ্য বর্তমানে ভারতের মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাজনীতি করুন, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন ব্যক্তি ও কৌম স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। কিন্তু বিভেদ বিষে ভারত আত্মার ক্ষতি করা চলবে না। তাহলে সেটা একদিন নিজের দিকেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে। ভারতবাসী চায় না আগামী দিনে ভারত আবার একবার খণ্ডিত হোক। □

ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার শুল্কযুদ্ধ ঃ সমস্যা ও প্রতিকার

আজ সময় এসেছে আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। আজও যদি আমরা একই রকমভাবে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে পারি এবং আমেরিকার পণ্য পরিষেবাকে সর্বাত্মকভাবে বয়কট করতে পারি তাহলে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

অম্লান কুসুম ঘোষ

একটি নিস্তরঙ্গ জলাশয় যেমন হঠাৎ করে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে কোনও একটি আকস্মিক আঘাতের অভিঘাতে, সেরকমই বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অঙ্গন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার সাম্প্রতিক শুল্কযুদ্ধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে।

শুল্ক যুদ্ধ কী? আমেরিকা সরকার বর্তমানে ঘোষণা করেছে ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া প্রতিটি পণ্যের ওপর তারা প্রচুর পরিমাণে শুল্ক ধার্য করবে, এই ঘটনাটিকেই বলা হচ্ছে আমেরিকার শুল্কযুদ্ধ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ জিনিস শুধু আমেরিকা ভারতের সঙ্গে করছে তা নয় অনেকগুলি দেশের বিরুদ্ধেই তারা শুল্কযুদ্ধ শুরু করেছে তবে ভারতের বিরুদ্ধেই তাদের আস্ফালন সর্বাধিক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কোনো দেশ অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর কত শুল্ক বসাবে তা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে এক্ষেত্রে আমেরিকার অন্যায় কিছু নেই কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয়, শুল্কযুদ্ধ কী তা জানতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে বেশ কিছুটা পথ।

দীর্ঘদিন ধরে গোটা পৃথিবীর বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি তার পূতিগন্ধময় অস্তিত্ব নিয়ে মহাকালের আস্তাকুঁড়ে বিদায় নেবার পরপরই গত শতকের নব্বই দশকের গোড়ার দিকে যখন ডব্লিউটিও স্থাপিত হয়েছিল, সে সময় স্থির হয়েছিল এক বিশেষ শুল্ক নীতি। স্থির হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যারা ডাব্লিউটিওর অন্তর্গত হচ্ছে তাদের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চলবে এবং এই মুক্ত বাণিজ্যের ওপর যথেচ্ছ শুল্ক বসানো চলবে না। এই বাণিজ্য নীতিতে কোনো দেশ অন্য কোনো দেশের পণ্য আমদানিতে কতখানি শুল্ক বসাতে পারবে তাও নির্ধারিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ ভারত আমেরিকাতে পণ্য রপ্তানি করলে তার ওপর আমেরিকা কত শতাংশ আমদানি শুল্ক বসাতে পারবে এবং ভারতে পণ্য রপ্তানি করলে ভারত তার ওপর কত শতাংশ আমদানি শুল্ক বসাতে পারবে তা নির্ধারিত হয়ে গেছিল সেই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবার সময়ই এবং স্থির ছিল যে এই চুক্তির বেশি শুল্ক কোনো দেশ বসাতে পারবে না।

এই চুক্তি অনুযায়ী শুরু হয়েছিল নতুন দুনিয়ার মুক্ত বাণিজ্য নীতি, মুক্ত অর্থনীতি, বিশ্বায়িত অর্থনীতির এই পথ চলা। সেই পথ চলার সাড়ে তিনদশক অতিক্রম করে এখন ডব্লিউটিও'র প্রবক্তা দেশ আমেরিকা নিজেই ভাঙতে চলেছে তাদের নিজেদেরই প্রবর্তিত সেই চুক্তি অনুযায়ী স্থিরীকৃত শুল্কনীতি। তাদের বক্তব্য, ভারত থেকে তাদের দেশে আমদানি হচ্ছে অনেক বেশি, তুলনায় তাদের দেশ থেকে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম, তাই তারা ভারত থেকে যেকোনো পণ্য বা পরিষেবা আমদানির ওপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাবে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ডব্লিউটিওর স্রষ্টা দেশ আমেরিকা, চুক্তিপত্র নির্মাণের আগে তারা ভাবেনি যে এরকম ঘটতে পারে, ভারত তাদেরকে বাণিজ্যে পরাজিত করতে পারে। তাহলে তারা তখন চুক্তি করল কেন?

প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে আছে এক অমোঘ সত্য। সাড়ে তিন দশক আগে নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় যখন এই ডব্লিউটিও চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল সেই সময়কার বিশ্ব অর্থনীতির পরিস্থিতি এবং ভারত ও আমেরিকা এই দুই দেশের পারস্পরিক অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তৎকালীন প্রযুক্তিতে উন্নত আমেরিকা মনে করেছিল তৎকালীন প্রযুক্তিতে অনুন্নত ভারতকে তারা সহজেই বাণিজ্যযুদ্ধে পর্যুদস্ত করতে পারবে এবং ভারতের বিশাল বাজারকে তারা কুক্ষিগত করতে পারবে। বিশেষত পরিষেবা নির্ভর বাণিজ্যজগতের নতুন বাহন হিসেবে তখন সে সময় বিশ্ববাজার মাত করে রেখেছিল কম্পিউটার এবং কম্পিউটার নির্ভর তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প। কম্পিউটারের ব্যবহার এবং কম্পিউটার নির্ভর তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের উপর আমেরিকার দখল তখন প্রশ্নাতীত, আর ভারত তখন কম্পিউটারের ব্যবহারে একেবারেই অনভিজ্ঞ। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়টিই তো ভারতের ছাত্র ও শিক্ষকরা প্রায় কেউই জানেন না। শিল্প ও বাণিজ্যের পরিকাঠামোগত অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভারত তখন আমেরিকার থেকে অনেক পিছিয়ে

ছিল। আমেরিকা এটারই সুযোগ নিয়েছিল, তারা ভেবেছিল ভারতীয়দের এই অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে শোষণ করে ছিবড়ে করে দেবে। কিন্তু ৯০ দশকের শেষ ভাগ থেকেই সময় চক্র ঘুরেছিল এবং পরিস্থিতি বদলে ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার। ৯০ দশকের শেষের দিকে তৎকালীন ভারত সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণের ফলে ভারতীয় ছাত্ররা কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত দক্ষতা লাভ করে এবং আমেরিকাকেও অনেকাংশে ছাপিয়ে যায়। পাশাপাশি তৎকালীন ভারত সরকারের উন্নততর পরিকাঠামো নির্মাণের সুবাদে ভারতের অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং তারাও আমেরিকার বাজার দখল করতে অনেকটাই সফল হয়। এই সব কারণেই বিগত তিন সাড়ে তিন দশক ধরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাপকাঠিতে ধীরে ধীরে ভারতের কাছে পরাজিত হয়েছে আমেরিকা এবং ভারত সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে। তাই এখন প্রত্যেক বছরই ভারতের আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকে আর এই জিনিসটি আমেরিকার স্বার্থ চিন্তায় ঘা দিয়েছে এবং সেই জন্যই তারা ভারতের বিরুদ্ধে এই নিম্নমানের শুল্কযুদ্ধ শুরু করেছে। অর্থাৎ ভারতকে শোষণের জন্য বানানো ডব্লিউটিও'র চুক্তিপত্র অনুযায়ী ব্যবসা করেও তারা ভারতের সঙ্গে পারছে না তাই ভারতের বাণিজ্যের অগ্রগতিকে থামানোর জন্য নিজেদের দ্বারাই স্থাপিত ডব্লিউটিও'র নিয়ম বহির্ভূত শুল্ক নিজেরাই বসানো শুরু করেছে। অর্থাৎ নিজেদের তৈরি নিয়ম নিজেরাই ভাঙছে নিজেদের স্বার্থে অন্যায়ভাবে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার এই অন্যায় শুল্কের প্রাচীর গড়ে তোলার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতের শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্র, ব্যাহত হবে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন। ভারতের কর্মসংস্থানের সংকোচন ঘটবে এবং সামগ্রিকভাবে আঘাত আসবে ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের উপর। তাই আমাদের দেশের উন্নততর ভবিষ্যতের স্বার্থেই এই শুল্ক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

এই শুল্কযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কীভাবে গড়ে তুলতে হবে? প্রতিরোধের আছে একটাই পথ, সেটা হলো স্বদেশী। স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জন। এই মন্ত্রেই আজ আমেরিকার বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। সমস্ত রকম আমেরিকান পণ্য বয়কট করা যেকোনো দেশপ্রেমিক ভারতীয়রই এখন কর্তব্য। দুধ, দইকে থালাতে স্থান দিয়ে পেপসি, কোলাকে নালাতে ফেলা এখন সময়ের দাবি। ম্যাকডোনাল্ড কে এফ সি'র খাবার আর কিনলে'র পানীয়— এসবের মোহ থেকে মনকে মুক্ত করে শুধুমাত্র স্বদেশী পণ্যের দিকেই আস্থা রাখা দরকার এবং তার সঙ্গে দরকার ভীষণভাবে আমেরিকান ই-কর্মার্স কোম্পানিগুলিকে বয়কট করা অর্থাৎ আমাজন, ফ্লিপকার্ট এগুলিকে বয়কট করা। এই কোম্পানিগুলি রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারের মতো ভারতীয় অর্থনীতিকে শোষণ করতে চায়। খুব সস্তায় তারা বহু পণ্য সরবরাহ করে ভারতের ঘরগুলিতে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রের এই পণ্যগুলি তারা কোনও ভুয়ো ভারতীয় কোম্পানির নামেই দেখায় এবং সেই কোম্পানিগুলির ৪৯ শতাংশ শেয়ার তাদের নিজের হাতে রাখে। প্রয়োজনে নিজেদের লাভ বাদ রেখে বা একটু ক্ষতি স্বীকার করেও তারা সস্তায় পণ্য ভারতের ঘরগুলিতে বিক্রি করে এবং ভারতীয় পরিবারগুলিও ধীরে ধীরে তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এর ফলে বিপদে পড়ছে সাধারণ দোকানদাররা। এর ভবিষ্যৎ কিন্তু ভয়াবহ হবে। দোকানদাররা ব্যবসা না চালিয়ে যখন দোকান গুটিয়ে নেবে তখন খুচরো জিনিস কেনার জন্য সম্পূর্ণভাবেই আমাজন বা ফ্লিপকার্ডের উপরে নির্ভর করতে হবে সাধারণ ক্রেতাদের এবং তখন কিন্তু এরা প্রচুর দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে। সে কারণেই আমেরিকান ই-কমার্স কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কট চালানো দরকার।

ব্রিটিশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশী যুগে ভারতবাসী স্বদেশী গ্রহণ বিদেশি বর্জন, বিদেশি পণ্য বয়কট ব্রিটিশ পণ্য বয়কট ধ্বনি দিয়ে এই চিন্তাভাবনার উপর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং সেই প্রতিরোধের কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল ব্রিটিশ শক্তিকেও। চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অতীতে আমরা এইরকম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। আজ সময় এসেছে আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। আজও যদি আমরা একই রকমভাবে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিতে পারি এবং আমেরিকার পণ্য পরিষেবাকে সর্বাত্মকভাবে বয়কট করতে পারি তাহলে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। □

সবুজের স্বপ্ন

আমার নাম সবুজ। বয়স বারো। আমার মন খারাপ। কেন জানো? বাবাকে আজ বললাম– জানো বাবা, আমি আজকাল একদম স্বপ্ন দেখি না।

দিলীপ রায় দাড়ি কামাচ্ছিলেন। তিনি অফিসে যাবেন। অফিসে সবাই তাঁকে বস বলে মানে। দাড়ি কাটা থামিয়ে তিনি বললেন— স্বপ্ন দেখছ না তুমি!

—না, একদম নয়। একটাও স্বপ্ন দেখছি না।

—এতে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

—হ্যাঁ, হচ্ছে। সবুজ জোর গলায় বলল।

—কীরকম অসুবিধা হচ্ছে শুনি একবার?

—আমি তো বুঝতেই পারছি না আমি রাতে ঘুমোচ্ছি না জেগে আছি।

—মানে কী বলছ তুমি? সারারাত কী কর?

—সারা রাত আমি শুয়ে থাকি।

—শুয়ে কী কর?

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

—শোন, তোমার স্কুল বন্ধ। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। খেলাধুলো হচ্ছে না। তাই বোধহয় তুমি স্বপ্ন দেখছ না।

—না বাবা, তুমি যা ভাবছ তা নয়।

ঠিক আছে, অফিস থেকে ফিরে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তুমি এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করো না।

সবুজ চুপ।

—কতদিন ধরে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে?

—তিনমাস। সবুজ বলল।

—এতো দিন বলোনি কেন?

—ভয়ে। তুমি সবসময় রেগে থাকো। মা থাকলে মাকে বলতাম।

দিলীপ রায়ের মনটা ক্ষণিকের জন্য খারাপ হয়ে গেল। গত বছর ডেঙ্গুতে মারা গেছেন স্ত্রী। তিনি বললেন, করোনার জন্য ব্যবসার অবস্থা খারাপ। তাই মাথা ঠিক রাখতে পারি না। বললেন—

—তোমার কি শরীর দুর্বল লাগে?

—শরীর নয়, মন দুর্বল লাগে। মনে হয় এই বুঝি আমি মরে যাব। সবুজের গলায় একটা ভয় উঁকি দেয়।

—বলো কী! তোমাকে এখনই ডাক্তার দেখাতে হবে।

—তুমি অত টেনশন নিয়ো না বাবা।

—তা বললেই তো টেনশন চলে যাবে না। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আমার টেনশন থাকবে। কিন্তু তোমার বিষয়টা আলাদা। দেখছি কী করা করা যায়।

দুই

—ডাক্তার রায় কী বললেন? উনি তো তোমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন।

সবুজ বলল— বাবা, ডাক্তার জেঠু বললেন, পৃথিবীর এক গভীর অসুখ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। এতে পৃথিবীর খুব কষ্ট হচ্ছে। পৃথিবী যদি অসুস্থ থাকে তবে মানুষ স্বপ্ন দেখবে কী করে? পৃথিবীর অসুখ সেরে গেলে আমি আবার স্বপ্ন দেখতে পারবো।

দেবদাস কুণ্ডু

জাতীয় উদ্যান

কিস্তওয়ার

কিস্তওয়ার জাতীয় উদ্যান ভারতের জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলার কিস্তওয়ার শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে ১৭০০ থেকে ৪৮০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এটি ২১৯০.৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ১৯৮১ সালে এটিকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। এখানে সিডার, নীল পাইন, রুপালি ফার, বার্চ প্রভৃতি বৃক্ষের প্রধান্য রয়েছে। জীবজন্তুর মধ্যে তুষারভল্লুক প্রধান। উদ্যানের ভেতরে রয়েছে কিবের, নাস্থ ও কিয়ার জলাশয়। এই উদ্যান পরিদর্শনের সময় হলো মার্চ-এপ্রিল মাস। উদ্যান পরিদর্শনের সময় পর্যটকদের অবশ্যই ট্রেকিং জুতা, ভারী পশমি কাপড়, রেইন কোট এবং জলরোধী উইন্ডচিটার সঙ্গে নিতে হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮১

अभ्यासं कुर्मः—
बालिका हसति। बालिकाः हसन्ति।
বালিকা হাসে। বালিকারা হাসে।
सेविका खादति। सेविकाः खादन्ति।
पाचिका पचति। पाचिकाः पचन्ति।
महिला ..... । .... ।
..... अभिनयति। नायिकाः .... ।
परिचारिका ... । .... नयन्ति।
कन्या क्रीडति। कन्याः .... ।
प्रयोगं कुर्मः—(নিজে নিজে বাক্য রচনা করতে হবে)
गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, खादति, पिबति, वदति, हसति, पश्यति, धावति।

ভালো কথা

কুকুরের আস্তানা

কদিন থেকে খুব বৃষ্টি। রাস্তার কুকুরগুলো সব আমাদের বাড়ির ভেতরে বারান্দায় আস্তানা গেড়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে ওগুলোর খুব গায়ের গন্ধ। বাবা আবার ওগুলোকে বিস্কুট, মুড়ি খেতে দিচ্ছিল। তাই মায়ের খুব রাগ। বাবা তখন বাড়ির বাইরে একটু উঁচু জায়গা দেখে একটা পলিথিন টাঙিয়ে, শুকনো খড় পাতা বিছিয়ে দিয়েছিল। কুকুরগুলো এখন বৃষ্টি এলেই ওখানে ঢুকে পড়ছে। বাবা এখনো ওদের সকালে মুড়ি, বিস্কুট আর দুপুরে ভাত খেতে দেয়। মা একটু গজর গজর করে, তাতে বাবা ভ্রূক্ষেপ করে না। ঠাকুমা বলে, ভালোই তো, ওগুলো থাকলে রাতে চোর আসবে না।

রত্না মহান্তি, অষ্টম শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ম শ্চি ব প
(২) জা ল প্র পা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) নি হি কা ণ পু রা
(২) সা র হি ক্ষ ব ক

১৮ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) অনুঘটক (২) অমরনাথ

১৮ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) বাধ্যতামূলক (২) বালিকাসুলভ

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (২) পিউ মণ্ডল, বিষ্ণুপুর, দঃ ২৪ পরগনা। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯। (৪) শুভম সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®

EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book & Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

রেশিমবাগ

নাগপুর, রামটেক তীর্থক্ষেত্র দর্শন

অমিত কুমার চৌধুরী

১৯৮৭ সালে সঙ্ঘের কার্যকর্তা হিসেবে সঙ্ঘের সর্বোচ্চ এবং অন্তিম শিক্ষণবর্গ তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত করার পর পুনরায় ৩৮ বছর পর নাগপুর ভ্রমণের সুযোগ পেলাম সঙ্ঘের সামাজিক সদ্ভাব বৈঠকে মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সহ-প্রমুখ হিসেবে। সেবার জীবনে প্রথম নাগপুরে পদার্পণ। ২৫ দিনের কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত করে শুধুই ডাক্তারজীর জন্মস্থান, তাঁর বাড়িটিই দেখে এসেছিলাম আর অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান কিছুই না দেখার অতৃপ্তি নিয়েই ফিরে এসেছিলাম। বহুদিন ধরেই মনের মধ্যে ইচ্ছে ছিল কবে সেই সুযোগ আসবে যেদিন সেই না দেখা স্থানগুলো দেখতে পাবো, বিশেষ করে শ্রীগুরুজীর বাড়ি। তাই এবার গত ২ ও ৩ আগস্ট ২০২৫ নাগপুরে অখিল ভারতীয় সামাজিক সদ্ভাব বৈঠকে অংশগ্রহণ করে বৈঠক শেষে সব কিছু ভালোভাবে দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে ছিলেন প্রান্ত প্রমুখ তোলারাম মণ্ডল। প্রথমেই নাগপুর রেলস্টেশনে স্থানীয় এক কার্যকর্তা আমাদের গাড়ি করে রেশমিবাগে নিয়ে এলেন। তাঁর উষ্ণ আন্তরিকতায়, ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম।

যেতে যেতে তিনি বললেন যে এটা সীতাবর্ডী এলাকা, এখানেই সীতাবর্ডী দুর্গ। শিহরণ জাগলো, ডাক্তারজীর সেই পতাকা নামানোর দুঃসাহসিক ঘটনার কথা মনে করে। এতো বছর পর কিছুই মেলাতে পারছি না, সব পালটে গেছে। এই সেই রেশিমবাগ যেখানে প্রথম সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ করেছি। ঠিক ৩৮ বছর আগে। পুরোনো সেই বিশাল ভবন সম্পূর্ণ ভেঙে নতুন করে নির্মিত হয়েছে কিন্তু অবয়ব প্রায় একই আছে। সেই পাণ্ডুরং ভবন, মাধব ভবন ও যাদব ভবন, অতিরিক্ত মধুকর ভবন নতুন সংযোজন। বৌদ্ধিক মণ্ডপেরও পরিবর্তন দেখলাম। তার নতুন নাম দেওয়া হয়েছে মহর্ষি ব্যাস সভাগৃহ। সেই সময় বৌদ্ধিক মণ্ডপেই ভোজন ব্যবস্থা ছিল। এখন দ্বিতল হওয়ায় নীচে সুন্দর ভোজনকক্ষ আর উপরে সুন্দর বিস্তৃত বৌদ্ধিক মণ্ডপ। পাশে আরও কিছু বৈঠকের জন্য ছোটো সভাগৃহ, কার্যালয় ও স্বাগত কক্ষ। চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ কঠোর। সবদিক মিলিয়ে সাতটি প্রবেশ দ্বার। সর্বত্র রক্ষী। শুধু ডাক্তারজী ও গুরুজীর স্মৃতিস্থান অপরিবর্তিত। মাথা নত করে, হাত জোড় করে সেই দুই মহাপুরুষদের উদ্দেশে প্রণাম করলাম। ভেসে উঠলো সেই ৩৮ বছর আগের স্মৃতি সেখানে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ২৫ জন শিক্ষার্থী ধুতি পাঞ্জাবি পরে ডাক্তারজীর মূর্তির সামনে তাঁর প্রিয় বাংলা গান 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি গেয়েছিলাম

ফঃ ৬

সমবেত কণ্ঠে। সহ প্রান্ত প্রমুখ প্রচারক জগন্নাথ সেনাপতি, সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখালেন। রেশিমবাগের সমস্ত কার্যকর্তা সে কার্যালয় হোক, ভোজন বিভাগ হোক, সকলেই দুদিন ধরে আমাদের জন্য আন্তরিকতার সাথে যে সেবা প্রদান করেছেন তা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

দুই দিনের বৈঠক শেষ করে নাগপুর থেকে বাস ধরে চললাম রামটেক। প্রায় দু'ঘন্টা পর পৌঁছলাম সেই বহু প্রতীক্ষিত শ্রীগুরুজীর বাড়ি। বাস থেকে নেমেই অটোচালক বললেন গুরুজীর বাড়ি? ভালো লাগলো ও গর্বিত হলাম এই ভেবে যে সকলেই ওই বাড়িটা শ্রীগুরুজীর বাড়ি বলেই চেনেন যিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীমাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। সেটা এখন বর্তমানে সঙ্ঘের বিভাগ কার্যালয়। সেখানে আমাদের চা পানে স্বাগত জানান ওখানে উপস্থিত কার্যকর্তারা। এই এক অখ্যাত গ্রামীণ এলাকায় ছোট্ট বাড়িতেই শ্রীগুরুজীর শৈশব, বাল্যকাল কেটেছে। সেই প্রতিভাধর সন্ন্যাসী সদৃশ শ্রীগুরুজী ডাক্তারজীর অপূর্ণ কাজের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সারা ভারতে সঙ্ঘ কাজের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। সেই বাড়িটিও পুরোনো ধাঁচা অপরিবর্তিত রেখে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়িতে উপর তলায় একটি ছোট্ট ঘরে শ্রীগুরুজীর কিছু দুর্লভ ছবি দেখে খুব ভালো লাগলো। তাঁর গুরু স্বামী অখণ্ডানন্দাজীর একটি ছবি দেখলাম। বাঙ্গালি হিসেবে গর্ব হলো যে আমাদের শ্রীগুরুজীর গুরু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই এবং তিনি আমাদের জেলা মুর্শিদাবাদে সারগাছি আশ্রমে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। শ্রীগুরুজী সারগাছি আশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দাজীর সেবা করেছিলেন। তবে শ্রীগুরুজী সেই বাড়ির কোথায় বসতেন, খেতেন, ঘুমোতেন, পড়াশোনা করতেন তা দেখা সম্ভব হয়নি, শুধু অনুভব করলাম যে এই বাড়িতেই সেই মহাপুরুষের জীবন কেটেছে।

শ্রীগুরুজীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম রামমন্দির দেখতে। বেশ প্রাচীন মন্দির। তারপর মহাকবি কালিদাসের স্মৃতিস্থান। কথিত যে, এখানেই কবি তাঁর অমর কাব্য রচনা করেছিলেন। পরে আরেকটি দর্শনীয় স্থান আম্বালা যা হিন্দুদের পিণ্ডদান কেন্দ্র যা একটি সুন্দর মনোরম হ্রদ, দেখে রওনা হলাম দেওলাপার গো-অনুসন্ধান কেন্দ্রে, যেখানে গোবর ও গোমূত্র নিয়ে গবেষণা হয় এবং বিভিন্ন ওষুধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপাদন হয়। সেখান থেকে কিছু দ্রব্য বাড়ির জন্য কিনে ফিরে এলাম নাগপুরে।

স্মৃতিমন্দির। নীচে শ্রীগুরুজীর স্মৃতিস্মারক।

পরের দিন রেশিমবাগ থেকে পদব্রজেই রওনা হলাম কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্দেশে। যেখানে সাধারণত সরসঙ্ঘচালক মোহনজী নিবাস করেন। পথে স্থানীয় মানুষদের জিজ্ঞাসা করতে করতেই চলে এলাম। প্রায় ২০-২৫ মিনিট সময় লাগলো। কিন্তু পথে সব মানুষই সঙ্ঘের কার্যালয় চেনেন ও জানেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের কার্যালয় যেতে সাহায্য করলেন যা আমাদের মুগ্ধ করেছে। মনে হলো নাগপুরে স্থানীয় সব মানুষেরই সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রবেশদ্বারে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী আমাদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে সসম্মানে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। সেখানে এক বাঙ্গালি নিরাপত্তা কর্মী আমাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বললেন এবং অন্যরাও আমাদের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করলেন। আর ঢুকেই ছবিতে দেখা সেই পাথরের অক্ষত কাঠামো এক তোরণদ্বার যেখানে ডাক্তারজী কয়েকজন নিতান্ত বালকদের নিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করে খেলাধুলার উপযোগী করে তুলেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক মহাল এলাকায় মোহিতেওয়ারের একটি ভাঙাচোরা বাড়ি। সেই মাঠ, সেখানে সঙ্ঘের প্রথম শাখা শুরু করেছিলেন, যে সঙ্ঘ শাখার বীজ বপন করেছিলেন যা আজ ভারতবর্ষের লক্ষ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সঙ্ঘের প্রথম শাখা এই মোহিতেওয়ারের শাখা। সেই প্রথম সঙ্ঘস্থানে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে সেই শাখার মাঠে জুতো পরেই যেতে পেছন থেকে এক মহিলা নিরাপত্তা কর্মী আমাকে জুতো খুলে যেতে বললেন। ভীষণ লজ্জিত হয়ে জুতো খুলে রেখে মাঠে প্রবেশ

করলাম। ভীষণভাবে আবেগে আপ্লুত হয়ে সেই শাখার পবিত্র মাটি উঠিয়ে কাগজে নিলাম। নিজেকে ধন্য মনে করলাম, কারণ এ আমাদের স্বয়ংসেবকদের কাছে পুণ্যভূমি। বাম দিকে সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় উঠে দেখলাম এক সংগ্রহশালা, যেখানে সযত্নে রাখা আছে ডাক্তারজী, গুরুজী এবং অন্যান্য সরসঙ্ঘচালকদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি। ডাক্তারজীর ব্যবহৃত চেয়ার, তাঁর কিছু পোশাক, কোট, প্রথম ধ্বজ। যে চেয়ারে তিনি বসতেন সেই গোলাকৃতি চেয়ার, কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় যে টিফিন ক্যারিতে তিনি হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসতেন সেই হলুদ রঙের বিশাল পাত্রটি, তাঁর লেখা অসংখ্য চিঠি পত্র যা দেখে ডাক্তারজীর জীবনীতে পড়া কথাগুলি হুবহু মিল খুঁজে পেয়ে এক অপার আনন্দ অনুভূত হলো মনের মধ্যে। শ্রীগুরুজীর ব্যবহৃত কলম, চশমা, রুদ্রাক্ষের মালা এবং পূজার কিছু সামগ্রী দেখলাম। এছাড়া বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে পাওয়া উপহার দেখে মনের মধ্যে এক অনির্বচনীয় আনন্দে আবেগে আপ্লুত হলাম।

১৯৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে মালদার ডিএসএ মাঠে শ্রীগুরুজীকে দূর থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো কিন্তু তখন তিনি কে তা বোঝার মতো বুদ্ধিও আমার ছিল না। শুধু এইটুকুই মনে আছে, এক ক্ষীণকায় চশমা পরিহিত, নস্যি রঙের পাঞ্জাবি পরা এক ব্যক্তি মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। কী বলেছিলেন তা বোঝার মতো

স্মৃতিমন্দির

বয়সও তখন হয়নি আমার। শ্রীগুরুজী এই নাগপুর কার্যালয়েই অন্তিম শ্বাস ফেলেছিলেন।

যথারীতি সব দেখে আবার বেরিয়ে পড়লাম সেই বিখ্যাত নীল সিটি হাইস্কুল যেখানে ডাক্তারজী পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে সেই স্কুলের নাম পরিবর্তন হয়ে ডিডি হাইস্কুল হয়েছে। দাদাসাহেব ধানওয়াতে তৎকালীন যুগে এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা জানালেন, তাঁর নামে করা হয়েছে এই স্কুলের নাম। এই সেই স্কুল যেখানে ডাক্তারজী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়ার জন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। রানি ভিক্টোটিয়ার জন্মদিনে এই স্কুলে বিতরণ করা মিষ্টি তিনি না খেয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছিলেন। স্কুলের এক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকা সব ঘুরে আমাদের দেখালেন এবং ডাক্তারজীর কথা বললেন। ২ নম্বর ক্লাস ঘরেই ডাক্তারজী ক্লাস করতেন। সেই ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। এই স্কুলে বিখ্যাত এক বিজ্ঞানী, খেলোয়াড় ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীন গড়করীও পড়াশোনা করেছেন। তাঁদের সকলের ছবি টাঙানো আছে। স্কুলে ডাক্তারজীর এক বড়ো ছবি টাঙানো আছে। দেখে

নাগপুর, ডাক্তারজীর বাড়ি।

রামটেক, শ্রীগুরুজীর বাড়ি।

মোহিতেওয়াড়ে প্রথম সঙ্ঘস্থান

খুব ভালো লাগলো। ওই স্কুলেরই এক ছাত্রীকে ডাক্তারজীর ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম ইনাকে চেনো? বলল, না। তখন তাকে ডাক্তারজীর কথা বললাম। স্কুলের ভেতর বাহির সব দেখে আবার চললাম ডাক্তারজীর বাড়ির দিকে।

গান্ধী গেট পেরিয়ে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের এক পূর্ণাবয়ব মূর্তি দেখে মন পুলকিত হলো। মনে হচ্ছিল আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কেন শিবাজীর মূর্তি নেই। তিনি তো সমগ্র হিন্দুদের জন্য, ভারতের জন্য লড়াই করেছিলেন। সেই মূর্তির বাঁ দিক বেয়ে পথ ধরে এগিয়ে এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি সানন্দে ডাক্তারজীর বাড়ির পথ বলে দিলেন। স্থানীয় মানুষেরা সকলেই ডাক্তারজীর বাড়ি চেনেন। কিন্তু দুঃখ হলো ডাক্তারজীর বাড়ি যাওয়ার সময় প্রধান সড়কে কোনো লেখা বা নির্দেশনার চিহ্ন না পেয়ে। স্থানীয় নাগপুর কর্পোরেশনের উচিত এতবড়ো একজন মহান ব্যক্তির বাড়ি যাওয়ার পথটা সহজে চিহ্নিত করা যাতে ভারতের যে কোনো প্রান্তের মানুষেরা তাঁর বাড়ি সহজে পৌঁছতে পারে। বাড়িতে প্রবেশের পূর্বেই প্রবেশ দ্বারে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বাড়িতে প্রবেশ করলাম। একজন রক্ষী সাদরে আমাদের 'জয় শ্রীরাম' বলে স্বাগত জানিয়ে সব কিছু ঘুরে দেখালেন ও সবকিছু বর্ণনা করলেন। সেই পুরোনো বাড়িটিকেই নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে সব কিছু আগের মতো রেখে। সব ঘুরে দেখলাম যেখানে ডাক্তারজীর জন্ম হয়েছিল, সেই কুয়ো যেখানে বাড়ির সকলের জলের উৎস, সেই ছোটো দেয়ালে ঘেরা ছোটো স্নানাগার যেখানে ডাক্তারজী স্নান করতেন। সেই আরাম কেদারা যেখানে ডাক্তারজী বসতেন, তাঁদের বাড়ির রান্নাঘর ও কিছু সেই সময়কার ব্যবহৃত রান্নার বাসনপত্র যা দেখে শিহরণ জেগে উঠলো শরীরে। ঐতিহাসিক দোতালার সেই ঘর যেখানে বসে ১৯২৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শুভ বিজয়াদশমীর দিন তাঁর ঘনিষ্ঠ ১৭ জন ব্যক্তিকে নিয়ে প্রথম চিন্তন বৈঠক করেছিলেন। সেই চিন্তন বৈঠক থেকেই অমৃত বেরিয়ে এসেছিল 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'। সবকিছু ভালোভাবে দেখে কিছু ছবি তুলে ফিরে এলাম দীক্ষাভূমিতে যেখানে ড. আম্বেদকর তাঁর মৃত্যুর ৫৬ দিন আগে বৌদ্ধমত গ্রহণ করেছিলেন। মনে বড় কষ্ট হয়েছিল যেখানে ডাক্তারজী জাতপাতহীন হিন্দু সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন তাঁর জন্মভূমিতেই ধর্ম ত্যাগের স্মৃতি বয়ে চলেছে সেই দীক্ষাভূমি। ইচ্ছে ছিল সীতাবর্ডী দুর্গ দেখার, যেখানে ডাক্তারজী বাল্যবয়সে তাঁর কিছু বন্ধুকে নিয়ে ব্রিটিশ পতাকা নামানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বছরে এক নির্দিষ্ট দিন ছাড়া ওটা খোলা থাকে না, তাই না দেখতে পাওয়ার দুঃখ নিয়েই ফিরে এলাম সেই এলাকা থেকে।

শেষে সন্ধ্যের সময় স্থানীয় এক সভাগৃহে নাগপুরের এক কার্যকর্তার ডাক্তারজী, গুরুজী ও দেওরসজী তিন সর সঙ্ঘচালককে নিয়ে লেখা একটি নাটক মঞ্চস্থ হলো যা দেখে খুব আনন্দ পেলাম। প্রায় পঞ্চাশজন কলাকুশলী মিলে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এটি তাঁদের ছিল ৩১ তম মঞ্চস্থ নাটক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করী ও সঙ্ঘের সহ সরকার্যাবাহ কৃষ্ণগোপালজী উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বাড়িয়েও তোলেন। মনের মধ্যে এই চিন্তাও এল কবে আমরা বঙ্গভূমিতে এই রকম নাটক মঞ্চস্থ করতে পারবো।

ডাক্তারজী ও গুরুজীর স্মৃতি বিজড়িত নাগপুর, রামটেক আমাদের সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নিকট এক পবিত্র স্থান যা দেখে মনে হলো যেন এক পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ করা হলো। □

রাজ্যে জনবিন্যাস পালটানোর ছক

প্রবুদ্ধ সমাজ কতদিন চুপ থাকবে?

বিপ্লব বিকাশ

কয়েক দিন আগে রাজ্যের কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও গবেষকদের সঙ্গে এক খোলামেলা আলোচনায় বসার সৌভাগ্য হয়েছিল। নানা বিষয় নিয়ে কথা চলছিল, কিন্তু আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এল একটা কথা, পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি দ্রুত পালটাচ্ছে এবং এই পালটে যাওয়াটা প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক নয়, বরং এর পিছনে আছে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। এই পরিবর্তন যদি চলতেই থাকে, তাহলে গণতন্ত্র তার প্রকৃত রূপে টিকে থাকতে পারবে না। সংখ্যা যদি হয়ে ওঠে প্রশাসন চালনার একমাত্র মাপকাঠি, তাহলে গণতন্ত্র বাধ্য হবে তার উদ্দেশ্য, চরিত্র ও রূপরেখা হারাতে। ডেমোগ্রাফিক গঠন থেকে সেই অঞ্চলের ডেমোক্রেসির চরিত্র নির্ধারিত হয়।

চর্চায় উঠে এল বহু অজানা কিংবা কম জানা তথ্য, ঘটনা আর যুক্তি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তাঁরা জানেন, তাঁরা বোঝেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁরা গভীরভাবে চিন্তিত। কিন্তু শুধু চিন্তা করলেই তো দায় সারা যায় না। গণতন্ত্রে প্রবুদ্ধ গোষ্ঠীর একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে, তা হলো লোকপ্রবোধন বা জনজাগরণ। কারণ সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের দৌড়ঝাঁপে সমাজের গভীর সমস্যাগুলো ধরতে পারেন না। কিন্তু সাংবাদিক, লেখক, গবেষক বা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তা দেখেন, বোঝেন। আর এখনো পর্যন্ত সমাজ তাঁদের উপর ভরসা করে, তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাই তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশি।

এক সুপরিকল্পিত ছক অনুযায়ী রাজ্যের ডেমোগ্রাফি যে পালটে দেওয়া চলছে তা নিয়ে সোচ্চার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দলমত নির্বিশেষে এই প্রশ্নে সত্যান্বেষী অবস্থান নিতে হবে। এটা কেবল রাজনীতির বিষয় নয়, এটা একটি রাজ্যের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। এখনো সময় আছে মানুষকে সাবধান করার, সতর্ক করার। গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি তো সচেতন মানুষ, অচেতন মানুষ নয়। সচেতন মানুষ নিজের জমি বিক্রি করার আগে ক্রেতার পরিচয় জেনে নেন, বিয়ে দেওয়া বা করার আগে সবকিছু ভালোভাবে জেনে নেন, কাদের থেকে কী কেনাকাটা করবেন তাও তাঁরা জানেন এবং পরিষ্কারভাবে বুঝে নেন যে যাকে নিজের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করছেন, সে কি তাঁদের কল্যাণের জন্য কাজ করবে না রাজ্যের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অংশ হবে?

রাজনীতি অবশ্যই চলবে, চলা উচিত। কিন্তু রাজনীতি কি শুধুই ক্ষমতা দখলের জন্য নাকি রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য? গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো জনকল্যাণ। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কেউ সরকার গঠন করে, আর কেউ বিপক্ষে আসন দখল করে। কিন্তু উভয়েরই সমান দায়িত্ব হলো জনগণের স্বার্থ রক্ষা ও রাজ্যের উন্নতির লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ করা। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেশের প্রকৃত নাগরিক কারা সেটা সুনিশ্চিত করা। কারণ এই প্রকৃত নাগরিকরাই দেশের সব কিছু।

প্রশ্ন উঠছে, এই দায়িত্ব ঠিকমতো পালিত হচ্ছে তো? শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজ কি মনে করছে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে? না, তাঁদের মধ্যেও স্পষ্ট এক উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাঁরা মনে করছেন, পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে এগোচ্ছে। জনগণের কল্যাণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে শাসনে থাকার লোভ আর ক্ষমতার অহংকার। ফলে রাজনৈতিক লড়াই আর জনস্বার্থের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, যা গণতন্ত্র এবং রাজ্যের মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর।

ডেমোগ্রাফি যেভাবে পালটে যাচ্ছে তাতে সামাজিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ছে। এই ভাঙন থেকে শুরু হয়েছে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়। অথচ এখনো যারা দায়িত্ববান, তাঁদের অনেকেই নীরব। হয়তো ভয়, হয়তো সুবিধার হিসেব। কিন্তু নীরব থাকা মানেই ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে থাকা।

আগামী প্রজন্ম প্রশ্ন করবে, যখন বিপদের ইঙ্গিত এতো স্পষ্ট ছিল, তখন তাঁরা কথা বললেন না কেন? আজকে পশ্চিমবঙ্গের সচেতন ও সক্ষম সাংবাদিক ও সাহিত্যিকরা নিজের মাইক, নিজের ক্যামেরা, কলম যদি এই কঠিন বাস্তবতাকে প্রকাশ্যে চর্চার জন্য ব্যবহার না করে পরিস্থিতির কারণে ছেড়ে দেন, তাহলে ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করবে না।

তাই আজই সময়। যে যার অবস্থান থেকে সত্যি কথা উচ্চারণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন যুক্তি, তথ্য, ইতিহাসের প্রমাণ নিয়ে সামনে আসা। যাতে সাধারণ মানুষও বুঝতে পারেন, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য তাঁকেও সতর্ক ও সজাগ হতে হবে। গণতন্ত্র কেবল ভোট দেওয়া নয়, গণতন্ত্র মানে সত্যি ও ন্যায়ের পাশে দাঁড়ানো। আজকের পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এটাই সবচেয়ে জরুরি। □

নিঃশব্দে চলে গেল শঙ্কর বাগ

বিজয় আঢ্য

শঙ্কর চলে গেল। শঙ্কর বাগ এভাবে হঠাৎ চলে যাবে (১৩.০৮.২৫) ভারতে পারিনি। কেননা দিন কুড়ি আগেও ফোন করেছিল। তবে শরীরটা যে ভালো যাচ্ছে না, কিছুটা বয়সের কারণেও, সেটা জানতাম। ও আমার থেকে সাত-আট বছরের ছোটো হলেও বয়স সংক্রান্ত সমস্যা একই। বছর পঞ্চাশেক আগে, ১৯৭৩-৭৪ হবে, তখনও ওর গায়ে কলেজের গন্ধ আছে, সেসময় ওকে নিয়ে অনন্তদা হাজির। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন মেদিনীপুর বিভাগ প্রচারক। কলকাতার এক শিক্ষিত সম্পন্ন পরিবারে মানুষ হয়েও অজ-পাড়াগাঁয়ের কোনো পরিবারের সঙ্গে এমন মিশে যেতে পারতেন; সম্ভবত এমন আদর্শবাদিতার কারণেই এঁরা নমস্য। তখন আরামবাগে। হরিণখোলা ব্রিজ তখনও হয়নি। নৌকায় করে মুণ্ডেশ্বরী নদী পেরিয়ে যেতে হতো।

স্থির হলো, শঙ্কর কামারপুকুরে থাকবে। ঠাকুরের জন্মস্থানে শাখা শুরু করবে। কামারপুকুরে হাটতলায় খড়ের চাল দেওয়া একটা মাটির ঘর। অ্যাটাচ বাথ— কল্পনা মাত্র। সরকারি টিউবওয়েল আর পুকুরপাড়ের ঝোপজঙ্গল। তা মাস ছয়েকের মধ্যে শঙ্কর শাখা বেশ জমিয়েছিল। বিকেলে শাখায় গ্রামের বালক-কিশোরদের নিয়ে খেলাধুলো। সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি দর্শন। ভক্তদের সঙ্গে গান। শঙ্কর নিজেও বেশ গান গাইত। সেখানে কয়েকটা পরিবারে ও 'ঘরের ছেলে' হয়ে গিয়েছিল। যেমন, নরেন-শম্ভুদের বাড়িতে মা ওকে বড়ো ছেলের মতোই দেখতেন। কামারপুকুরেই বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র শাখা, যেখানে 'বিকির' (শেষ) হওয়ার পরও শাখা শেষ হয় না। ঠাকুরের প্রতি প্রণাম মন্ত্র 'স্থাপকায় চ ধর্মস্য' মন্ত্রোচ্চারণের পর শেষ হতো। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সঙ্ঘচালক শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশায় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর পরামর্শ মতো এই রীতি এখনও চালু আছে।

একবার অনন্তদার সঙ্গে আমরা দুই ভাই (সহোদর দিলীপ আঢ্য) শঙ্করদের গ্রামের বাড়িতে গেছিলাম। একদিন ছিলাম। শঙ্করের পিতৃদেব সৃষ্টিধর বাগ ও মা সরোসীবালা দেবী তখন জীবিত। ওরা পাঁচ ভাই, এক বোন। শঙ্কর মেদিনীপুরের এক ছাত্রাবাসে থেকে বিএ পাশ করে। পরে 'হোমিওপ্যাথি' নিয়ে ডাক্তারি পাশ করে জীবিকা অর্জন ও সংসারজীবন শুরু করে। ওর স্ত্রী ও এক কন্যা রয়েছে। প্রায় এক বছরের এক নাতিও।

সঙ্ঘের কাজের সূত্রেই ১৯৮১ সালে ব্যাঙ্গালোরে জেলা ও তদূর্ধ্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রচারকদের এক সর্বভারতীয় বৈঠকে আমাদের যেতে হয়েছিল। আমাদের পাঁচজনের দলে শঙ্করও ছিল। অন্য দুজন আমাদের জ্যেষ্ঠ— অনন্তদা ও রাধাগোবিন্দ পোদ্দার। হিমাংশু দিন্দা আমাদের সমবয়সি। সঙ্ঘের কাজের ব্যাপ্তির এক প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং সেইসঙ্গে ভারতদর্শন, বিশেষত দক্ষিণ ভারত দর্শন।

একটা সার্কুলার টিকিট কাটা হয়েছিল। তিরুপতি-চেন্নাই- পণ্ডিচেরী- কাঞ্চী- ত্রিচিনাপল্লী- শ্রীরঙ্গম-মাদুরাই-রামেশ্বরম- কন্যাকুমারী- অজন্তা- ইলোরা হয়ে প্রত্যাবর্তন। কন্যাকুমারীতে মাননীয় একনাথজীর 'গেস্ট'। তিন সমুদ্রের তীরে 'নতুন ভারত'-এর উত্থানের ছবি স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টিতে যেখানে ধরা পড়েছিল।

প্রথমে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পরে উত্তর চব্বিশ পরগনা বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে এরপর শঙ্কর বারাসতে আসে। পরে সংসার জীবনের চাপে যোগাযোগ খানিকটা শিথিল হয়। বর্তমান প্রজন্মের অনেকের সঙ্গেই ওর তেমন পরিচয় হয়নি। সত্যের সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে শঙ্কর কখনো আপোশ করেনি। নিজ সিদ্ধান্তে ওর অনড় থাকা কারও কারও কাছে অনভিপ্রেত হতে পারে, তবুও বলব, সত্য-কে (নিজের বিশ্বাস মতো) আঁকড়ে থাকা যদি মনুষ্যত্ব হয়, শঙ্কর তেমন একজন মানুষ। □

(৩৫)

গল্পকথায় ডাক্তারজী

স্বাতন্ত্র্য দৈনিক

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বরাজ্য নয়, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচারে একটা বড়ো মাধ্যম চাই। এই চিন্তার পরিণতিতে ডাঃ হেডগেওয়ার, বিশ্বনাথরাও কেলকর, ডাঃ খারে, বাসুদেব ফড়নবীশ, গোপালরাও ওগলে, বলবন্তরাও মণ্ডলেকর প্রমুখ ব্যক্তি মিলে ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি 'স্বাতন্ত্র্য' নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 'স্বাতন্ত্র্য প্রকাশন মণ্ডল' নামে একটি সমবায় সংস্থা তৈরি করে ডাক্তারজী ও ডাঃ খারে বেরার ভ্রমণ করে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন। ১৯২৪ সালের শুরুতে 'স্বাতন্ত্র্য' কার্যালয় খোলা হয় এবং শুরু হয় প্রকাশন পর্ব। 'স্বাতন্ত্র্য দৈনিক' সপ্তাহে সোমবার ছাড়া প্রতিদিনই প্রকাশিত হতো। প্রতি সংখ্যার মূল্য ধার্য ছিল দুই পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক সাড়ে বারো টাকা। ডাক্তারজী 'স্বাতন্ত্র্য'-এর জন্য বহুরকম কাজ করতেন, কিন্তু পরিবর্তে কোনো অর্থ গ্রহণ করতেন না।

ডাক্তারজীর স্বভাবের মধ্যেই ছিল, যে কাজই তিনি করবেন তা নিরহংকার হয়ে নিরলস কাজের মধ্য দিয়ে সফলতার পথে এগোনো। কেউ কাজে অবহেলার নিদর্শন তৈরি করলে ক্রোধ প্রকাশ না করে কাজের মধ্য দিয়ে তাকে অনুতাপের সুযোগ দিতেন। একবার এক ব্যক্তি যার উপরে স্বাতন্ত্র্য দৈনিকের সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব ছিল, তিনি ডাক্তারজীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে অসুস্থ বলে সেদিনের জন্য ছুটি চাইলেন। ডাক্তারজীর বুঝতে অসুবিধা ছিল না যে, সে সত্য কথা বলছে না। তার খাবার জায়গা ডাক্তারজীর আন্দাজ ছিল, তিনি অফিসে কিছু কাজকর্ম করে ফড়নবীসের প্রাসাদে গেলেন, রোধকার মতো তিনি তার সঙ্গে দোলনায় গল্প করছিলেন। পাশে কয়েকজন তরুণের অনেক জোরে কথাবার্তার আওয়াজ শুনে ডাক্তারজী সেখানে যেতেই সহ-সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সে তখন সবার সঙ্গে তাস খেলছিল।

বলা বাহুল্য, সম্পাদক মহোদয় ডাক্তারজীকে দেখে বেশ লজ্জিত হলেন, কিন্তু ডাক্তারজী তাকে কিছু না বলে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। এই 'স্বাতন্ত্র্য দৈনিক' ২০২৪-এর শেষে সঙ্কটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়ালো। এক বছরে প্রায় ১১ হাজার টাকার ঘাটতি। অনেক ভাবনাচিন্তা বিচার বিমর্শ করা হলো, আর শেষে সিদ্ধান্ত নিতে হলো, যে 'স্বাতন্ত্র্য' প্রকাশন বন্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যে কয়েকজন সম্পাদকও পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু শেষ অবস্থায় সমস্যা দাঁড়াল দৈনিক পত্রিকাটি বন্ধের দুর্নাম কোনো সম্পাদক তার কাঁধে নিয়ে চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারজী এই গরল পানের দায়িত্বটি নির্দ্বিধায় হাতে তুলে নিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর নিঃস্বার্থ সেবার অটুট মনোবৃত্তি থেকে। ১৯২৫-এর প্রথম দিকে ডাক্তারজী 'অপযশের সম্পাদক' শেষ সম্পাদকীয় লিখে দৈনিক স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ বন্ধের ঘোষণ করেন। 'স্বাতন্ত্র্য' বন্ধ হলেও একটা মানহানির মামলা তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত চলছিল। এমন সর্বতোমুখী সেবা কর্মের যোদ্ধা ছিলেন ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩২

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবীমাহাত্ম্য, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা